কৃষি-শিক্ষা।

শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত।

KRISHI SIKSHA

BEING A TREATISE

ON

INDIAN AGRICULTURE

WITH THE

MODERN VIEWS ON THE SUBJECT

BY

KALIMAY GHATAK.

কলিকাতা,

১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্;

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রে, শ্রীনিত্যানন্দঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৫।

মূল্য ৷৷০ আনা।

াক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়কে দেখিতে দেন। রাজেন্দ্র বাবু তৎকালীন পাণ্ডু লিপির কোন কোন দোষের উল্লেখ রেন, এবং উহার সার ও পাইট বিষয়ক পাঠ দুইটীকে বপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করা আবশ্যক এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

আমি ভূদেব বাবু ও রাজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে পাণ্ডু লিপির নানা স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন, বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত সার ও পাইট বিষয়ক পাঠ দুইটী বিস্তৃত করিয়া পরিশেষে সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্ ও রসায়নবিৎ ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে সংশোধনার্থ পাণ্ডু লিপি অর্পণ করি। তিনিও যথোচিত যত্ন ও উৎসাহসহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত অভিপ্রায় লিপি বদ্ধ করিয়াছেন,—

"It gives me much pleasure to say that I at the quest of the author went through the Manascrift ıd carefully revised both the matter and style. I am of opinion that "Krishi-Siksha" will ake a very useful School-book and that the gene- readers will derive much practical knowledge out cultivation by reading it."

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছি, কেবল এ গ্রন্থ পাঠে তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই; াতে উপযুক্ত রূপ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা-

দিগকে গ্রন্থে লিখিত উপদেশানুসারে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত শস্যাদির উৎপত্তি ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে হয়। যেহেতু বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-সংযোগে উদ্ভিজ্জের উৎপত্ত্যাদির বৈষম্য হইয়া থাকে। যাহাহউক কৃষি শিক্ষাকে সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী ও ফলোপধায়ক করিবার জন্য আমি যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিয়াছি। বহুকাল হইতে নিরক্ষর কৃষক মণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকায় এ দেশীয় কৃষির যে রূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সুশিক্ষিতগণের মনোযোগ ব্যতিরেকে তাহার উন্নতির কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যদি কৃষি শিক্ষার দ্বারা অস্মদ্দেশীয় হীনাবস্থ কৃষির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হয়, আমি তাহাতে আমার সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল জ্ঞান করিব।

রাণাঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়
১৫ই চৈত্র। ১২৮৫।

শ্রীকালীময় ঘটক।

আরম্ভ।

"বাণিজ্যে বশতা লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি ;
দর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।"

অর্থনীতি সম্বন্ধীয় এই শ্লোকটী বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে
প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু উহার সত্যতা বিষয়ে বোধ হয়, এ-
শীয় কাহারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই ; থাকিলে সকলেই না
উন, অধিকাংশ ব্যক্তিই উহার অনুসরণ করিতেন। এমন
সার সদুপদেশে উপেক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জন ও সাংসারিক
স্বচ্ছন্দতার জন্য অনুপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বনে কষ্ট
ওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এ সংসারে যাঁহাদের
র্থ উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন আছে, তাঁহাদিগের অধি-
ংশই বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প এই তিনের অন্যতম অবলম্বন
রেন, এই অভিপ্রায়ে আমি উপরি উক্ত শ্লোকটী আশ্রয়
রিয়া চারিটী নীতি রচনা করিয়াছি। উক্ত শ্লোকের এক
কটী চরণ, সেই নীতি চারিটীর বিষয় হইয়াছে। কোন্
তিতে কি কি লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা
ল।

প্রথম নীতি।

"বাণিজ্যে বশতা লক্ষ্মীঃ—"

১। বাণিজ্য কি ? ২। বাণিজ্যে উন্নতি হয় কে‍· ৩। মূল ধনের অভাবে বাণিজ্য হয় কি না ? ৪। বাণি দ্বারা কাহার কি হইয়াছে। ৫। এদেশীয় নিম্নশ্রেণি পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য শুভজনক। ৬। এদেশী মধ্যবিত্তগণের কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য শু জনক। ৭। বাণিজ্যে চাকরীর অপেক্ষাও মান বেশি ৮। সমবেত বাণিজ্যে সুবিধা। ৯। এখন আর সে ব নাই। ১০। নীলাম ও সুরতি। ১১। বাণিজ্য কাযে উপযোগী লিখন, গঠন ও অঙ্ক। ১২। কোন্ দ্রব্যের বাণি কি রূপে করিতে হয়।

দ্বিতীয় নীতি।

"—তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি ;—"

১। কৃষিকার্য্য কি ? ২। মনুষ্যের প্রথমাবস্থায়বাণিজ্য পেক্ষা কৃষি সহজ, সুবিধাজনক ও একমাত্র অবলম্বন। ৩ কৃষির ভাল মন্দ। ৪। বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প কেন ৫। কৃষিই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল। ৬ । কৃষকগণ কোন ?

শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন কি না? ৭। কোন্ কোন্ শিল্প এদেশীয় সামান্য লোকের অবলম্বনীয় ও লাভজনক? ৮। কৃষিকার্য্য কি রূপে করিতে হয়? ৯। কৃষি পরাশর। ১০। কৃষি বিষয়ক প্রবাদ। ১১। সার। ১২। পাইট। ১৩। প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কি রূপ। (ক) খর্জ্জুর। (খ) পাট। (গ) আলু। (ঘ) হরিদ্রা। (চ) কোপি। (ছ) আদা। (জ) পলাণ্ডু। (ঝ) তামাক। (ট) ধান্য। (ঠ) পান। (ড) চা। (ঢ) তুত। (ত) নীল। (থ) ইক্ষু। (দ) কার্পাস। ১৪। বারমেসে। ১৫। আওলাত। ১৬। কৃষির যন্ত্রাদি। ১৭। পশুপালন। ১৮। জমি জমা। ১৯। এক লাঙ্গলের আবাদ, খরচ, উৎপন্ন ও লাভ।

তৃতীয় নীতি।

"—তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং—"

১। কোন্ শ্রেণীর লোক চাকরী করে এবং কেন করে? ২। চাকরীর লাভ, কৃষির লাভাপেক্ষা অল্প, ইহার তাৎপর্য্য কি? ৩। চাকরীতে বড় মানুষ হয় কি না? ৪। সকল শ্রেণীর লোকেরই চাকরীতে লোভ হয় কেন? ৫। চাকরীর দোষ গুণ। ৬। চাকরী কত প্রকার। ৭। কোন্ প্রকার চাকরী করা উচিত? ৮। এককালে চাকরী না করিলে চলে কি না?

চতুর্থ নীতি।

"—ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।"

১। ভিক্ষায় লাভ নাই। ২। কাহারা ভিক্ষা করে? ৩। ভিক্ষা প্রথা কেন হইল? ৪। ভিক্ষুক অতি নীচ। ৫। অন্যায় ভিক্ষা দানে আলস্য বৃদ্ধি হয়। ৬। বঙ্গদেশে ভিক্ষুকের উৎপাত। ৭। ভিক্ষুক কত প্রকার?

মৎপ্রণীত উল্লিখিত নীতি চতুষ্টয়মূলক গ্রন্থের নাম "নব-নীতি বোধ"। উহাকে চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা গিয়াছি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এক একটী নীতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক নীতি, কয়েকটী পাঠে বিভক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি উপরি উক্ত নীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় নীতিটী "কৃষি শিক্ষা" নাম দিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় নীতিটী প্রথমে প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য কৃষিশিক্ষার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা গিয়াছে। এই খণ্ড সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক ও পরীক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে সাদরে পরিগৃহীত হইলে "নবনীতি বোধের" সমস্ত অংশ প্রকাশিত হইবে।

কৃষি-শিক্ষা।

দ্বিতীয়-নীতি।

"—তদদ্ধং কৃষিকর্ম্মণি—"

প্রথম পাঠ।

কৃষিকার্য্য কি ?

তরু, গুল্ম, লতা, শৈবাল, ছত্রাক ইত্যাদিকে উদ্ভিদ্ কহে, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। উদ্ভিদ্গণ মৃত্তিকা, জল ও বায়ু হইতে রসাকর্ষণ করিয়া এবং সূর্য্যকিরণ সংযোগে প্রধানতঃ পত্র দ্বারা সেই রসের পরিপাক করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদ্ দ্বারা জন সমাজের অধিকাংশ কার্য্য চলিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ ছাড়িয়া মানুষের এক দিন চলে না। আমাদের অন্ন, আচ্ছাদন ও আবাস, উদ্ভিদ্ ভিন্ন তাহাদের কিছুই হইতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান আহারীয় উদ্ভিদ্ হইতে জন্মে। চাউল, দাউল,

গম, ভুট্টা, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট ফল, মূল, তরকারি, সকলই উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিদ্ ও খনিজ পদার্থের সংযোগে সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তুত হয়। যথা ঘরের দুয়ার, জানালা, কড়ি, বরগা, রুয়া, শাঁড়ক, বাকারি, শলা, খড়, সিন্ধুক, বাক্স, তক্তাপোষ, লাঙ্গল, কোদাল, খন্তা, মই, দড়ি, দড়া, নৌকা, গাড়ি, সূত্র, বস্ত্র, লেপ, বালিস্, মাছুর, থলে, পিঁড়ি, খৈল, বিচালি, কাগজ, কলম ইত্যাদি। যে প্রণালী দ্বারা এতাদৃশ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ সকলকে উপযুক্ত রূপে উৎপন্ন করা যায়, তাহার নাম কৃষিকার্য্য।

পরম সুখের সামগ্রী যে, ফল ও ফুলের বাগান, তাহা কৃষি কার্য্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকার উদ্ভিদ্ উৎপাদিকা শক্তিই, এই কৃষি কার্য্যের মূল। আমরা সংস্কার দোষে মৃত্তিকাকে অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। কোন পদার্থকে সামান্য বলিতে হইলে মাটীর সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু মাটীই যে, আমাদের সর্ব্বস্ব তাহা একবারও ভাবি না। যে সকল কার্য্য কেবল মনুষ্যের ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়, তাহাতে আমরা শীঘ্র শীঘ্র আশানুরূপ ফল দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষি কার্য্যে সে রূপ ঘটে না। ইহাতে সময় ও মাটীর উৎপাদিকা শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মাটীর উৎপাদিকা শক্তিই কৃষির অধিকাংশ সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহার তুলনায় মনুষ্যের সাহায্য অল্পই আবশ্যক হয়।

যেমন এক জন শিল্পকর কোন বন্য বৃক্ষ হইতে এক দিনে একটী সুন্দর বাক্স তৈয়ার করিতে পারে; কিম্বা অপ-

রিষ্কৃত লৌহ হইতে সুপরিষ্কৃত ও সুশাণিত ছুরিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে; অথবা এক জন বণিক আপন ব্যবসায় কার্য্যে এক দিনে পাঁচ টাকা লাভ করিতে পারে; তেমনি এই সকল কার্য্যের মধ্যে বিরাম আছে। কারণ মানুষের শরীর প্রতি দিন সমান বহে না এবং উহার অন্য বিধ ব্যাঘাত সকলও নিয়তই উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির বিরাম নাই। ঐ মহাশক্তি মানবকুলের হিতৈষিণী দেবতার ন্যায় বিঘ্নকে পায় ঠেলিয়া অবিশ্রান্ত তাহাদের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। আমরা যখন শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকি, জল-ঝড় রৌদ্রাদির ভয়ে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া থাকি, কিম্বা পীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকি, ঐ শক্তি তখনও কোন বীজকে অঙ্কুরিত করিতেছেন, কচি পাতাটীকে পাকাইতেছেন, কড়িকাটীকে ফুটাইয়া ফুলে সুগন্ধ,—ফলে অমৃত স্বাদ বিতরণ করিতেছেন।

ফলতঃ উৎপাদিকা শক্তিই জল, বায়ু, আলোক ও তাপ এই গুলিকে সহযোগী করিয়া কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঐ গুলির উপযুক্ত রূপ যোগাযোগ হইতেছে কি না আমাদিগকে কেবল তাহাই দেখিতে হয়। যিনি উত্তম রূপে উহা দেখিতে পারেন, তিনিই উত্তম কৃষক।

তোমার বন্ধুর হাতে একখানি উত্তম ছুরি দেখিয়া তোমার তাহা পাইতে ইচ্ছা হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে ঠিক্ সেই রূপ একখানি ক্রয় করিয়া আনিলে। কিন্তু তোমার বন্ধুর বাগানের উত্তম উত্তম ফল ফুলের

গাছের ন্যায় গাছ গুলি, এক দিনে তৈয়ার করিতে পারিবে না। বৃক্ষাদি তৈয়ার করিতে বালক কালে মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না বটে; কিন্তু তজ্জন্য পরে অনুতাপ হয়। অতএব অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় বালক কাল হইতেই বৃক্ষাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা উচিত। কেবল শিক্ষা নয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম্ভ করিতে হইবে। বালক গণ যদি দশ বার বৎসর বয়স হইতে কৃষি কার্য্যে বিশেষতঃ উদ্যান কার্য্যে মনোযোগ করে, তাহাহইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। তাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই সাংসারিক অন্যান্য সুখের সঙ্গে হস্তার্জ্জিত বৃক্ষের ফলভোগের অপূর্ব্ব সুখও ভোগ করিতে পায়।

দ্বিতীয় পাঠ।

মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি সহজ, সুবিধা জনক ও এক মাত্র অবলম্বন।

মনুষ্যেরা জীবিকার্জ্জন ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভের জন্য যে সকল কার্য্য করেন, তৎসমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম পাশুপাল্য, দ্বিতীয় কৃষি, তৃতীয় বাণিজ্য। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যেরই অন্তর্গত। চাকরি, ভিক্ষাদি উপায় গুলি অপ্রধান এবং অধিকাংশ উপায় কৃষি বাণিজ্যেরই আনুষঙ্গিক। আদিমাবস্থ মনুষ্যেরা যখন উলঙ্গাবস্থায় তরু কোটরে কিম্বা

দ্বিতীয় পাঠ।

গিরি গহ্বরে বাস করিতেন, তখন বন্য ফল মূল, মৃগয়ালব্ধ মাংস এবং নদী কিম্বা ঝরণার জলে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন নূতন পশু সন্ধান এবং তাহা বধ করিয়া তাহার মাংস সংগ্রহ করিতে হইত। কোন দিন মাংসাদির সমাবেশ না হওয়ায় হয়ত উপবাস করিতেও হইত। এমন অবস্থায় দুই চারিটী জীবিত পশু ধরিয়া রাখা, কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা জনক, ইহা অবশ্যই আদিম মানবগণেব মনে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রূপেই পশু পালন ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়।

স্বভাব জাত বৃক্ষাদি হইতে সর্ব্বদা মনের মত ফল মূল প্রাপ্ত না হওয়ায়, ঐ রূপে কৃষিরও উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক কৃষি প্রণালীর উৎপত্তি হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার নামানুসারে "পৃথিবী" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি প্রণালীর উৎপত্তি স্বাভাবিক; ব্যক্তি বিশেষকে উহার উৎপাদক বলিয়া বোধ হয় না। তবে পৃথ্বীরাজের দ্বারা উহার উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সহজেই স্বীকার করা যায়। যাহাহউক, আদিমাবস্থায় কৃষি দ্বারা যে সকল ফল, মূল, শস্যাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহা হইতে আপন আপন প্রয়োজনমত সামগ্রী রাখিয়া তাহারা অবশিষ্ট অপরকে দিতে লাগিল। অপরে আবার তাহার পরিবর্ত্তে আপন কৃষির উৎপন্ন অন্য বিধ সামগ্রী নিজের প্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট তাহাকে দিতে লাগিল। এই রূপেই বাণিজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। বাণিজ্যের এই প্রণালীকে বিনিময় প্রথা কহে। ঐ প্রণালীর বাণিজ্য কার্য্যে বিলক্ষণ অসু-

বিধা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বিবিধ মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায়, ঐ অসুবিধার সম্যক্ নিবাকরণ হইয়াছে।

যাহাহউক, উক্ত বিবরণ দ্বারা প্রতীত হয় যে, কৃষি কার্য্য মনুষ্যের প্রথম অবস্থাতেই অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান সমাজে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্থহীন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, গোয়ালা, মুসলমান যে জাতিই কেন হউন না এ গ্রন্থে তাঁহাদিগকে প্রথমাবস্থার লোক বলা যাইবে। এক জন সুস্থ, সবল ও পূর্ণ বয়স্ক লোকের যদি কিছুমাত্র সংস্থান না থাকে, সে কোদাল, দা, খন্তা, প্রভৃতি যৎসামান্য দুই তিন খানি অস্ত্র লইয়া কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এক জন মানুষে স্বহস্তে চারি পাঁচ বিঘা ভূমির আবাদ করিতে পারে। ঐ পরিমিত ভূমিতে ন্যূন সংখ্যায় যোল শত লোকের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইতে আপনার সংবৎসরের খাদ্য রাখিয়াও কিছু থাকিয়া যায়। উহা দ্বারা সে পূর্ব্ব বৎসরের ঋণ শোধ কিম্বা লাঙ্গল গোরু করিবার জন্য উহা সঞ্চয় করিতে পারে। যুক্তিতে যে রূপ দেখা যাইতেছে, দৈব ঘটনায়, কার্য্যে বাস্তবিক সেরূপ না ঘটিতেও পারে। সেরূপ না ঘটিলেও কৃষি যে বাণিজ্যাপেক্ষা প্রথমাবস্থার লোকের পক্ষে সহজ ও সুবিধা জনক, উহা দ্বারা সেটী প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ ইহাতে বেশি মূল ধনের প্রয়োজন রাখে না। বিশেষতঃ যাহারা স্বহস্তে কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহাদের আরও অল্পতর মূল ধনে চলিতে পারে। গোরু ও বীজের মূল্য এবং ভূমির খাজনা ইহার জন্যই কিছু টাকার

প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে আবার গোরু ও বীজের মূল্য প্রতি বৎসর লাগে না। যে শস্য বপণ করা যায়, অবাধে ন্যূন পরিমাণে তাহার ত্রিশ চল্লিশ গুণ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন শস্য হইতে সংসারের ও আবাদের খরচ রাখিয়া প্রায়ই কিছু থাকা সম্ভব। চেষ্টা করিলে বোধ হয়, সকলেই কিছু কিছু রাখিতে পারেন। এই অতিরিক্ত অংশ হইতে ক্রমশঃ ঘর দ্বারের উৎকর্ষ সাধন, পরিবারের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা, এবং বাণিজ্যার্থ মূল ধনের সংস্থান হইতে পারে। বিদ্যা ও অর্থের মিলনই সাংসারিক প্রধান উন্নতি। অতএব যাহাদের উপার্জ্জনের কোন উপায় নাই এবং উদরান্নেরও সংস্থান নাই, তাঁহাদের সাবধানে কৃষি কার্য্য করাই বিধেয়।

বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যাদি উৎকৃষ্ট বর্ণের অবস্থা নিতান্ত হীন হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে স্বহস্তে হল চালনার প্রথা নাই। স্বহস্তে হল চালনা করিতে না হইলেই ভাল। কিন্তু উদরান্নের জন্য ভিক্ষু হওয়া কিম্বা অন্য বিধ অসৎকার্য্য করাপেক্ষা লাঙ্গল চসা ভাল।

তৃতীয় পাঠ।

কৃষির ভাল মন্দ।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কৃষি কার্য্যের ছয় প্রকার বিঘ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সকল বিঘ্নের নাম ইতি। যথা

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পঙ্গপাল, শুক জাতীয় পক্ষী, বিদেশীয় আক্রমণকারী রাজগণ। এই সকল উৎপাত কৃষির এবং তদুৎপন্ন শস্যাদির বিশেষ অনিষ্টকর। এক সময়ে অতি বৃষ্টি দ্বারা কৃষির যেমন হানি হয়, সময়ান্তরে এক কালে বৃষ্টি না হইয়াও তদধিক ক্ষতি করে। মূষিকাদি যে, কৃষির অনিষ্টকর ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহা সামান্য অনিষ্ট, ইহা দ্বারা কৃষির বিশেষ হানি হয় না। বিদেশীয় কোন রাজা দেশ আক্রমণ করিলে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রজারা স্ব স্ব ধন প্রাণ লইয়াই শশব্যস্ত হয়; সুতরাং কৃষি কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারে না। ১৮৭০ খৃঃঅব্দে ফরাসি ও প্রুসিও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে প্রুষিওগণ জয়ী হইয়া কৃষির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফরাসিদিগের নিকট হইতে বহুলক্ষ অর্থ লয়, ইহা অনেকেরই বিদিত থাকিতে পারে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রুসিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে কৃষির সমতা রক্ষার্থ রুষিওগণ অগ্রেই স্বদেশ মধ্যে দশ হাজার লাঙ্গল বৃদ্ধিকরেন।

কৃষি কার্য্যের এই সকল পুরাতন ব্যাঘাত ভিন্ন অধুনা এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। দেশের দেব মাতৃকতা এবং ভূমির অনুর্ব্বরতাই সেই ব্যাঘাত। যে দেশের আবাদ কেবল বৃষ্টি বারির উপর নির্ভর করে, সেই দেশকে দেবমাতৃক কহে। ভারতবর্ষ এই রূপ দেশ।

এ দেশীয় কৃষির পক্ষে পূর্ব্বে দেবমাতৃকতা অনুকূল উপায় ছিল। কারণ পূর্ব্বে যথাকালে সুবৃষ্টি, প্রায়ই

হইত; বৃষ্টির অভাবে শস্য হানি হইত না। বিশেষ, পূর্ব্বে এখনকার মত এ দেশীয় শস্য বিদেশে রপ্তানি হইত না এবং লোক সংখ্যাও এখনকার মত অধিক ছিল না। অধিকন্তু ভূমিও বিলক্ষণ উর্ব্বরা ছিল। সুতরাং তখন একবৎসরে যে শস্য জন্মিত, তদ্দ্বারা দুই তিন বৎসর চলিয়া যাইতে পারিত; এক বৎসর বৃষ্টির অভাব বা আতিশয্যে কৃষির ব্যাঘাত হইলে দেশের বিশেষ হানি হইত না। এখন পূর্ব্বের তুলনায় সকলই বিপরীত। সুতরাং এ বৎসর কোন গতিকে কৃষির একটু মাত্র ব্যাঘাত হইলে, আর বৎসর নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে এবং শত সহস্র মহা প্রাণীর বিনাশ হইবে। *এই রূপেই বিগত দশ বার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার,* উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও বোম্বের মধ্যে কয়েকটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে।

যে ভূমি উপযুক্ত রূপ শস্য প্রসব করে না, তাহাকে উর্ব্বরা বলা যায় না। আমাদের দেশ স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর নহে; কোন কারণ বশতঃ এখন সম্পূর্ণ শস্য প্রসব করে না। কি কারণে ভূমি কম উর্ব্বরা হইয়া যাইতেছে? এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ এক বিধ শস্যের চাস করিলে ঐ জমির তেজ কমিয়া যায়। এই জন্য এ দেশের চাসারা দুই তিন বৎসর অন্তর দুই তিন বৎসর জমি ফেলিয়া রাখে কিম্বা তাহাতে অন্য প্রকার শস্যের আবাদ করে। কোন্ শস্যের পর কোন্ শস্যের আবাদ করিলে ভূমি ও শস্য কাহারই হানি হয় না, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। কারণ ক্রমশঃ লোক সংখ্যার আধিক্য

এবং রপ্তানি হেতু শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন আর জমি ফেলিয়া রাখিবার যো নাই। এক জমিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আবাদ করিলে ভূমি সহসা অনুর্ব্বরা হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশে ধানের চাসই প্রায় সর্ব্বত্র; যে হেতু ধানই এ দেশের প্রধান শস্য। কাজেই ভূমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইয়া আসিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে দেশের দেবমাতৃকতার প্রতি-কূলতা এবং ভূমির অনুর্ব্বরতা এখন কৃষির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক। এ বিষয়ে দেশের রাজা ও জমিদারগণ মনোযোগী না হইলে কেবল মাত্র প্রজাগণের যত্নে কিছুই হইতে পারে না। দেশের সর্ব্বত্র খাল কাটাইয়া এবং বাধ বাঁধাইয়া এ রূপ বন্দবস্ত করা উচিত যে, চাসারা আবাদি জমিতে আবশ্যক মত জল পাইতে পারে এবং অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল সহজেই ভূমি হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। মেদিনীপুর জিলার কোন কোন নদীতে ঐ রূপ বন্দবস্ত আছে, বোধ হয় তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এ দেশের সর্ব্বত্র ঐ রূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক; যেখানে ঐ প্রণালী ব্যবস্থাপনের নিতান্ত ব্যাঘাত আছে, সেখানে কাজেই হইবে না। শস্য ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন প্রথা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বিহারেও ১৮৭৪।৭৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে খাল কাটান হইয়াছে। বঙ্গদেশেও খাল খননের কিছু কিছু আয়োজন দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, আর দশ বার বৎসরের মধ্যে, জলের অভাবে বা অতিরিক্ত

সম্ভাবে এ দেশীয় কৃষি কার্য্যের অনিষ্ট, এক কালে নিবারিত হইবে। বিলাতীয় গবর্ণমেণ্টের জয় হউক, যেহেতু তাঁহারা প্রাচীন ভারতকে বর্ত্তমান জন সমাজের অনুরূপ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, নিয়ত খালের জল সিঞ্চনে কৃষি ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়া যায়; কূপ বা পুষ্করিণীর জলে ক্ষেত্রের তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। অতএব কৃষি ক্ষেত্রের নিকটে কূপ ও পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করাও বিধেয়।

লাবণিক পদার্থ এবং যবক্ষার জান, উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী। খালের জলে ঐ দুই পদার্থ কম, কিন্তু বৃষ্টির জলে উহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পুষ্করিণীর জলাপেক্ষা কূপোদকে লাব ণিক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে (১)।

ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে ভূমি সময়ে সময়ে জলপ্লাবিত হওয়াই সর্ব্ব প্রধান। নদীতীরবর্ত্তী স্থান সকলের মধ্যে স্বভাবতই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এ দেশে, বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ২৪ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জিলায় অনেক বিল ও ঝিল আছে। তাহাতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকায় তাহার সমস্তাংশে কোন ক্রমেই আবাদ হইতে পারে না। যদি সেই জল, আবশ্যক মতে কিয়ৎ পরিমাণে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ সকল জলাভূমিতে উত্তমরূপে আমন ধানের চাস হইতে পারে। ঐ সকল স্থানকে আবাদের উপযুক্ত করিতে বড় অধিক ব্যয় হয় না। জমিদারেরা একটু মনোযোগ করিলেই উহা হইতে পারে।

জমিদার ঘর হইতে টাকা দিলে কোন ক্রমেই ঐ টাকার লোকসান হয় না। ঐ সকল স্থান আবাদের যোগ্য হইলে উচ্চ হারে বিলি হইতে পারে। যদি জমিদার নিজকোষ হইতে উক্ত কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে অসম্মত হন, তবে অন্ততঃ প্রজাদিগকে উহার উপযোগীতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেও তাহাদিগের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা ঐ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

চতুর্থ পাঠ।

বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প কেন ?

প্রাচীন নীতিবিদ্‌পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প। ইহার কারণ কি বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাদের মূলধন অধিক থাকে না, তাহারাই প্রায় কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কারণ মূল ধনের অল্পতা বা এক কালে অভাব হইলেও, কোন রূপে কৃষিকার্য্য চালাইতে পারা যায়। যাহারা এরূপ যৎসামান্য ভাবে কৃষি আরম্ভ করে, তাহাদের নগদ অর্থ-লাভ প্রায়ই ঘটে না; কোন রূপে মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু ঐ সকল লোক সহিষ্ণুতা সহকারে দীর্ঘ কাল কৃষিকার্য্য চালাইতে পারিলে তদ্দারা ক্রমশঃ অর্থলাভ হইতে

পারে। উহা বাণিজ্য-লব্ধ অর্থের ন্যায় প্রচুর না হইলেও উহা দ্বারা সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা লাভের কোন ব্যাঘাত হয় না। বরং অনেক চাকুরে অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল হয়। ক্ষেত্র জাত বিবিধ শস্য ও বিবিধ বস্তু সর্ব্বদা সংগ্রহ থাকে; কোন বিষয়ে কোন অভাব থাকে না। "চাসী বাসী" গৃহস্থের সুখ দেখিলে বোধ হয়, তাহার ঘরে বাহিরে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন!

একজন কৃষিজীবী গৃহস্থ শস্যাকারে বার্ষিক যত লাভ পান, একজন চাকুরে নগদ অর্থে তদপেক্ষা অধিকলাভ পাইলেও তাঁহার সাংসারিক শৃঙ্খলা, প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় হয় না।

ভূমির খাজনা, মহাজনের সুদ, অজন্মা কিম্বা অতিশয় সুজন্মাদি কারণে কৃষির লাভসমষ্টি অল্প হইয়া পড়ে। কারণ এ বৎসর উত্তমরূপে শস্যাদি হইল, পর বৎসর কিছুই হইল না, কিন্তু খাজনা, মহাজনের সুদ, আবাদ খরচ সকলই সম পরিমাণে লাগিল। তবে যদি, অধিক মূল ধন খাটাইয়া কৃষির সহিত শিল্পের যোগ করা যায়, অর্থাৎ নীল, রেশম, তুত, চা, গুড়, ইত্যাদির কুঠী কারখানা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাণিজ্যের তুল্য, কিম্বা স্থল বিশেষে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন করিতে পারিলেও অধিক লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও অধিক মূলধনের প্রয়োজন। ইয়ুরোপীয় অনেক সাহেব এবং এ দেশীয় অনেক জমিদার নীল, তুত, খর্জ্জুর, ইক্ষু প্রভৃতির চাস করিয়া পরে উপরি উক্ত সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। নীলের গাছ

জলে পচাইয়া নীল তৈয়ার করা, পলুপোকাকে তুত পাতা খাওয়াইয়া রেশম প্রস্তুত করা এবং খর্জ্জুর ও ইক্ষুর রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য সকল শিল্পের মধ্যে গণ্য। সুতরাং এ স্থলে কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে, এদেশের অধিক লোকেই অপারক। সুতরাং কৃষি কার্য্য দ্বারা অধিক অর্থ লাভ করা, এদেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ঘট। বোধ হয়, এই জন্যই এ দেশে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির অল্প লাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয় অনেক অর্থবান্ সাহেব ভারতবর্ষের নানা স্থানে কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট স্থান সকল মনোনীত করিয়া তাহাতে বহু সংখ্যক কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সকল কুঠী দ্বারা প্রথম প্রথম এ দেশীয় প্রজাগণের অনেক উপকার হইয়াছিল। তাহারা নীল, তুত ইত্যাদি নিজ আবাদে প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল কুঠীতে সুমূল্যে বিক্রয় করিত এবং অর্থ কৃস্র উপস্থিত হইলে কুঠী হইতে অল্প সুদে টাকা ধার পাইত। ক্রমে নানা কারণে নীল কার্য্যের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল এবং প্রজার উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঐ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক প্রজা নীল কার্য্যে সাহায্য করা রহিত করিল। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারী নীলকরগণের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করায় এক কালে অনেক কুঠী বন্ধ হইয়া যায়।

এ দেশীয় জমিদার ও ধনী লোকেরা বোধ হয়, সাহেব

দিগের অনুকরণেই ঐ সকল কার্য্য আরম্ভ করেন। এরূপ অনুকরণ প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। কার্য্যক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের অভাবই, এরূপ অকৃতকার্য্যতার মূল। প্রতি বৎসরেই নীলের হাটে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হয়। সাহেবের কুঠীর যে নীলের মণ দুই শত টাকা দরে বিক্রীত হয়, বাঙ্গালীর কুঠীর সেই রূপ নীলের দেড় শত টাকা দর হওয়া ভার হয়! সাহেব বাঙ্গালী বলিয়াই যে, দরের এরূপ তারতম্য হইয়া থাকে তাহা নহে; উভয়ের নীলের মধ্যে বাস্তবিকই তারতম্য থাকে। বাঙ্গালী কুঠীওয়ালার শৈথিল্য, অক্ষমতা ও অনুৎসাহ বশতঃই সেরূপ ক্ষতিজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়।

কৃষি কার্য্যে অধিক মূলধন নিয়োগ করিতে না পারা, বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প হইবার যেমন একটী কারণ, আমাদের উপযুক্ত রূপ কার্য্যক্ষমতার অভাবও সেই রূপ তাহার অপর একটী কারণ। 'ক্ষেতের কোণ বাণিজ্যের ধন'— এই প্রবাদের তাৎপর্য্য এই যে, বাণিজ্য দ্বারা যে পরিমাণে লাভ হইতে পারে, ক্ষেত্রে ষোল আনা ফসল হইলে বাণিজ্যাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সচরাচর সম্পূর্ণ শস্য পাওয়া যায় না বলিয়াই বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শস্য জন্মিবার যে সকল ব্যাঘাত আছে তাহা দূর করা মানুষের অসাধ্য নহে।

পঞ্চম পাঠ।

কৃষিই, শিল্প ও বাণিজ্যের মূল।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটী পরস্পর নিতান্ত সাহায্য সাপেক্ষ। ইহাদিগের একটীর অভাবে অন্যটী চলিতে পারে না। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন কৃষি কার্য্য চলিতে পারা সম্ভব হইলেও, কৃষি ভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কোন ক্রমেই চলিতে পারে না। মনুষ্য জাতির নিতান্ত আদিমাবস্থায় যখন শিল্প ও বাণিজ্যের কল্পনাও তাঁহাদিগের মনে উদিত হয় নাই, তখনও তাঁহারা কৃষি কার্য্য করিতেন। তখন স্বাভাবিক সূচাগ্র প্রস্তর খণ্ড কিম্বা ঝটিকাভগ্ন তরু-শাখা দ্বারা ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু যদি এ রূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহারা সতূষ ধান্য চর্ব্বণ না করিয়া ধান্য হইতে চাউল, চাউল হইতে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কৃষিকার্য্যে না হউক, জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়ে সেই বনবাসী আদিম মানব গণকেও কিয়ৎ পরিমাণে শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহা অতি পূর্ব্ব কালের কথা। বর্ত্তমান কালে ঐ তিনের মধ্যে কি রূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহারই আলোচনা করিতে হইবে।

খনি খনন, তাহা হইতে ধাতু উত্তোলন, এবং সেই ধাতু দ্বারা কৃষি কার্য্যোপযোগী বিবিধ অস্ত্র ও যন্ত্রনির্ম্মাণ—এ সকলই শিল্পের অন্তর্গত। কোদাল, খন্তা, কাস্তে, লাঙ্গল,

বিদা, মই ইত্যাদি ভিন্ন সুচারুরূপে কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষি কার্য্যে শিল্প সাহায্য অপরিহার্য্য।

বাজারে বিক্রয় হয় বলিয়াই লোকে পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। অতএব বাণিজ্যের সুবিধা না থাকিলে শিল্পের উন্নতি হয় না। আবার গাড়ী, নৌকা, থলে, চালা, কৌটা, বাক্স, দাঁড়ী, বাটখরা ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেহেতু শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ। কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্যে ও এই রূপ সম্বন্ধ। কৃষি দ্বারা খাদ্য ও সুখ সামগ্রী উৎপন্ন না হইলে আদৌ বাণিজ্যের প্রয়োজনই হইত না। আবার বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, কৃষকগণ কেবল আপনার প্রয়োজন মত শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অনাহারে মরিয়া যাইত। কিম্বা সকলকেই উদরান্নের জন্য আপন হাতে লাঙ্গল ধরিতে হইত। তাহা হইলে পৃথিবীর এরূপ উন্নতাবস্থা কখনই হইত না। কিন্তু বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত থাকায়, কৃষক আপনার প্রয়োজনাপেক্ষা অনেক অধিক শস্যাদি উৎপন্ন করে। কারণ কেবল খাদ্য সামগ্রী হইলেই চলে না, কৃষক অন্যান্য গৃহ সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য অতিরিক্ত শস্য বিক্রয় দ্বারা অর্থ লাভ করে। কৃষকাদির এই রূপ স্বার্থ সাধন চেষ্টা হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য দ্বারাই অপর সাধারণের অভাব মোচন হয়।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, কৃষির সাহায্য ব্যতিবেকেও শিল্প ও বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন লাপ-লণ্ড, গ্রীনলণ্ড, ফিনলণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কেবল মৎস্য মাংস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও সেই সেই দেশে ঐ দুই দ্রব্যেরই বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঐ দেশ বাসীরা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া মৎস্য ও পশু হননোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কিছু মাত্র কৃষির সাহায্য প্রয়োজন হয় না। এই কথা প্রকৃত হইলেও কৃষির প্রাধান্য অস্বীকার করিবার কারণ নাই। যেহেতু রসায়ন বিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, কেবল মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যে দীর্ঘকাল অব্যাহত বা জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব তাহাদিগকে কোন না কোন রূপ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল দেশও এক কালে কৃষিনিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যেরূপ খাদ্য মনুষ্যকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করে, তাহা কৃষি ভিন্ন জন্মে না। এই জন্যই, কৃষিকে শিল্প ও বাণিজ্যের মূল বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পাঠ।

কৃষকগণ কোন রূপ শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন কি না?

যে প্রণালী দ্বারা স্বাভাবিক বস্তু সকল ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে, তাহাকে শিল্প কার্য্য কহে। ধান্য স্বাভাবিক

পদার্থ। তাহাকে ব্যবহার যোগ্য করিবার জন্য প্রথমে সিদ্ধ করিতে হয়, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঢেকিতে ভানিয়া তুঁষ হইতে পৃথক্ করিতে হয়; পুনর্ব্বার উত্তম রূপে ঢেকিতে কাঁড়াইয়া পরিষ্কৃত করিলে চাউল প্রস্তুত হয়। সেই চাউলকে আবার জলের সহিত অধিক পরিমাণে অগ্নিতাপ সহযোগে সিদ্ধ করিলে তবে আহারোপযোগী অন্ন প্রস্তুত হয়। তণ্ডুল প্রস্তুত করা হইতে অন্ন পাক পর্য্যন্ত যত গুলি ক্রিয়া করিতে হয়, সে সকলই শিল্প কার্য্য। তবে আতপ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে হইলে ধান্যকে সিদ্ধ করিতে হয় না। সেই রূপ কার্পাস ফল হইতে তুলা পৃথক্ করা, তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত, সেই সূত্র দ্বারা বস্ত্রবয়ন—এই গুলিও শিল্পকার্য্য। অতএব দেখা যাইতেছে, কৃষির সহিত শিল্পের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ। শিল্প ভিন্ন কৃষি প্রায় নিষ্ফল।

কৃষি ও শিল্প পরস্পর এত সংসৃষ্ট যে স্থল বিশেষে উহাদিগকে পৃথক্ করা কঠিন হয়। শিল্পের লক্ষণানুসারে শস্য বৃক্ষ হইতে শস্য পৃথক্ করা; পাঠ, শণ, মেস্তা ইত্যাদি কাচিয়া সাণ্টি তৈয়ার করা—এগুলিও শিল্প কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু কৃষকেরা ঐ গুলিকে কৃষি কার্য্যের মধ্যেই ধরিয়া থাকেন। কৃষক বা কৃষকপত্নীগণের মধ্যে বাস্তবিকই কিছু কিছু শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল শিল্প কার্য্য তাঁহাদের নিজ আবাদের দ্রব্য সকলের সহিতই সংসৃষ্ট। কৃষকের ঘরে পাট, শণ, কার্পাস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কৃষকেরা প্রথমে আপনাদের ঘর দ্বার নির্ম্মাণ, গাড়ী প্রস্তুত, শস্য ক্ষেত্রের বেড়া বাঁধা প্রভৃতি

কারণে ঘরেই পাট বা শণের দড়ি কাটে। ক্রমে তাহার উদ্ধৃত্তাংশ সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। গৃহজাত রজ্জু বিক্রয়ে যাহা পায়, তাহা তাহাদের বিলক্ষণ লাভ বোধ হয়। এই লাভে প্রলোভিত হইয়া ক্রমে অধিক দড়ি কাটিতে থাকে। ঘরের চাসে যদি কার্পাস হয়, কৃষক কামিনীগণ তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করে এবং তাহা বস্ত্রবয়নকারিগণকে প্রদান করিয়া আপনাদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র বয়ন করিয়া লয়। বস্ত্রবয়নকারিগণকে পারিশ্রমিক কিছু অর্থ দিতে হয়। সেই অর্থ নগদ কিম্বা স্থল বিশেষে তদ্বিনিময়ে কোন রূপ শস্য দিলেও চলিতে পারে। এই রূপে বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লওয়ায় লাভ বোধ হয়, এই জন্য কৃষকের ঘরে ক্রমশঃ সূত্র প্রস্তুত করার প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। কিন্তু এদেশে ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রচলন সহকারে ঐ রূপ সূত্র ও বস্ত্র প্রস্তুত করা এখন প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। সূঁচমুখী নামে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, বোধ হয় তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কৃষকেরা শস্য ক্ষেত্রের বেড়ার ধারে ধারে ঐ বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। তাহার পত্রে এক রূপ সূত্র প্রস্তুত হয়। সেই সূত্রে উত্তম শিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাট হইতেই সচরাচর শিকা হইয়া থাকে। কৃষক স্ত্রীগণের মধ্যে শিকা একটী প্রধান শিল্প সামগ্রী। উহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজনে লাগে। এই জন্য উহার বিক্রয়ে বেশ লাভ হয় দেখিয়া অন্যান্য উপায়-হীন স্ত্রীগণেও অন্যান্য আজীবের সহিত শিকা ভাঙ্গাইয়া থাকে। পাট বৃক্ষের ছাল পৃথক্ করিয়া লইলে যে কোমল

ও লঘু কাষ্ঠ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম পাটকাপাটি বা পাকাটি। উহাকে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সেই সকল খণ্ডের উভয় প্রান্তে গন্ধক লাগাইয়া দিলে দেশীয় দেসলাই প্রস্তুত হয়। কৃষকের ঘরে পাকাটীর অভাব নাই। তাহাদের স্ত্রীগণে হাট বা বাজার হইতে কিঞ্চিৎ গন্ধক আনিয়া ঐ দেসলাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহা তাহারা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত করে না, কেবল নিজ প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে।

দেশীয় দেসলাই প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ শিল্প; ইচ্ছা করিলে সকলেই প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু ঐ শিল্প সকলে না করিবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম, উহা প্রস্তুত করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে, অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে। এ সংস্কার নিতান্ত অমূলক। কিন্তু গন্ধক গলাইবার সময় যে ধূম উৎপন্ন হয়, তাহার আঘ্রাণে যে বিশেষ দৈহিক অনিষ্ট হয় তাহাতে সংশয় নাই। দ্বিতীয়, উহা বিক্রয়ে তাদৃশ লাভ নাই।

দুগ্ধ হইতে দধি, ঘৃত, নবনীত, মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করাই গোপজাতীয় কৃষকগণের প্রধান শিল্প। এক সের খাটী দুগ্ধ হইতে ঐ সকল দ্রব্যের অন্যতম নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে:—

দধি	...	...	...	/৸০
নবনীত	...	...	...	/০
ছানা	...	...	..	/।০
মাখন	...	...	...	/০
ক্ষীর	...	...	...	/।০
ঘৃত	...	...	...	/`৫

দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া প্রস্তুত করিবার এক প্রকার কৌশল আছে। ঐ গুঁড়া দীর্ঘ কালের পরও আবার দুগ্ধ রূপেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাহাজে ভ্রমণ-কারীরা সচরাচর ঐ গুঁড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদে-শীয় গোপ জাতীয় কৃষকদিগের ঐ কৌশলটী শিক্ষা করিবার কোন উপায় হইলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সর্ব্ব দেশীয় সাধারণ স্ত্রীগণকে এমন অনেক শিল্প কার্য্য করিতে হয়, যাহা কেবল নিজ প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে। যেমন রন্ধন, সীবন, তাম্বূল সজ্জাকরণ, গৃহ মার্জ্জন ইত্যাদি।

সপ্তম পাঠ।

কোন্ কোন্ শিল্প এ দেশীয় সামান্য লোকের অবলম্বনীয় ও লাভজনক (১)।

কুলাল, কর্ম্মকার, নাপিত, মোদক, তন্ত্রী, মালাকর, স্বর্ণকার, সূত্রধর, রজক, তৈলকার ইত্যাদি জাতি এ দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ী। *কোন না কোন রূপ শিল্পই ইহাদিগের* উপজীব্য। উক্ত জাতিগণ কোন্ কোন্ শিল্প কি রূপে করিয়া থাকেন, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই, এদেশের প্রায় সকলেই তাহা অবগত আছেন।

অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিক আচার, সকল দেশেই স্ব স্ব

---

(১) এই পাঠটী এই প্রবন্ধের সহিত নিতান্ত সংসৃষ্ট বোধ হওয়ায় এই স্থলেই সন্নিবেশিত হইল।

প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষ উহার প্রধান লীলাস্থল। এদেশীয় ব্যক্তিগণ পুরুষানুক্রমে যিনি যে ব্যবসায় করিয়া থাকেন, সহসা প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। নিষ্কর্ম্মা দুঃস্থ লোক অস্মদ্দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছেন। তাঁহারা অন্ন বস্ত্রের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিবেন, সেও ভাল; তথাপি কোন রূপ শিল্প কি ব্যবসায় অবলম্বন করা আবশ্যক জ্ঞান করেন না। সহসা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা সামান্য লোকদিগের পক্ষে তাদৃশ সহজ নহে বটে; কিন্তু মনে করিলে যে সে ব্যক্তি যে সে দেশীয় শিল্প অনায়াসে অবলম্বন করিতে কিম্বা চিরাবলম্বিত শিল্পের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মনে কর, এক জন কর্ম্মকার ক্রমে স্বর্ণকার হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারেন। এক জন সূত্রধর, চিত্রকর কিম্বা ভাস্করের অধিক লাভজনক কার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন। এই রূপে প্রত্যেক শিল্পকর, কিয়ৎপরিমাণে স্ব স্ব শিল্পের সদৃশ শিল্পান্তর অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই রূপে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা প্রতিবেশী শিল্পকর দিগের নিকট দেখিয়া শুনিয়া সামান্য ভাবে শিল্প কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন।

প্রকৃতির দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? এ দেশীয়দিগের অভ্যাস ও সংস্কার দোষ সত্ত্বেও উক্তরূপ ঘটনা সকল, সমাজ মধ্যে ক্রমে সংঘটিত হইতেছে। এক জাতির কর্ম্ম, অন্যজাতির করিতে নাই. এরূপ জ্ঞান বর্ত্তমান কালে কুসংস্কার বলিয়া ধরিতে হয়। ক্রমে এ সংস্কার দূর হইতেছে।

এখন চারি দিকেই দেখা যায়, এক জাতির কর্ম্ম অন্য জাতিতে গ্রহণ করিতেছেন। ইহাকে সামাজিক মঙ্গলের চিহ্ন বলিতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, বিলাতে সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ পৌরোহিত্য, কেহ রাজ মন্ত্রীত্ব, কেহ বা চর্ম্মকারের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অদ্যাপি ঠিক ঐ রূপ প্রথা প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু অতি দীর্ঘকাল পরে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে।

স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও ক্ষমতা সর্ব্ব প্রকার কার্য্য করণে উপযোগিনী নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে কার্য্য বিশেষে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অভিরুচি, তাঁহাকে যতদিন তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত না করা যায়, তত দিন তিনি সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। যাঁহার বস্ত্র বয়ন করিতে আমোদ ও উৎসাহ আছে, তাঁহাকে ক্ষৌর কার্য্যে নিযুক্ত করা অন্যায়। যাঁহার সূত্র ধরের কার্য্য ভাল লাগে, তাঁহাকে হাঁড়ি ঘড়া কুমারের কার্য্য করিতে বলাও অন্যায়। বিদ্যা শিক্ষা এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়েও এই নিয়ম প্রতি পালিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে এ নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যেহেতু যে জাতি বহুকাল হইতে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে নাই, সেই জাতির এই রূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। যথা মালাকরের সন্তান চির কালই সোলা কাটিয়া টোপর গড়াইবে। রজক তনয় চিরকালই বস্ত্র ধৌত করিবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এখন ক্রমশঃ এই প্রথার অন্যথা হইতেছে।

কর্ম্মকার, তন্ত্রী, রজক, নাপিত ইত্যাদি শিল্পিগণের কার্য্যে বিশেষ লাভ নাই। লৌহ নির্ম্মিত যাবতীয় সামগ্রী এবং কলের সূতা ও কাপড় বিলাত হইতে এদেশে আমদানী হওয়ায় কর্ম্মকার ও তন্ত্রীর কার্য্য লাভ হীন হইয়াছে। নাপিত, রজক, ইত্যাদির ব্যবসায় স্বভাবতই স্বল্প লাভজনক। অতএব এই সকল শিল্পীর, অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প অবলম্বন করা উচিত; তাহা হইলে অবশিষ্ট রজকাদিও লাভবান হইবে। স্বর্ণকার, কাঁসারি, তৈলকার, মোদক, চিত্রকর প্রতিমা ও গৃহ নির্ম্মাতা, ভাস্কর, চর্ম্মকার, ইত্যাদির কার্য্য অপেক্ষাকৃত লাভ জনক। নিম্ন শ্রেণীস্থ যাবতীয় লোকই ঐ সকল কার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন। তবে বর্ত্তমান কালে জাতি বিশেষের, কার্য্য বিশেষ অবলম্বন করা নিষিদ্ধ মনে করিতে হইবে। যেমন মোদক কিম্বা চর্ম্মকারের কর্ম্ম সকলেই অবলম্বন করিতে পারেন না। মুচি, ডোম, কাওরা নিকারী, মুসলমান ইত্যাদি জাতিগণের, বোধ হয়, চর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করায় বিশেষ আপত্তি না থাকিতে পারে। নবশাখ জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিই মোদকের কার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন। সদ্গোপ, মালী, তেলি, তাঁতি, মোদক, বারুজি, কুমার, কামার এবং নাপিত এই কয়টী জাতিকে নবশাখ কহে। ঐ দুইটী কার্য্য ভিন্ন অপরাপর কার্য্য, সর্ব্ব জাতীয় ব্যক্তিই করিতে পারেন। তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন অনিষ্টের শঙ্কা নাই। তবে জাতি বিশেষের, কার্য্য বিশেষ অবলম্বন পক্ষে প্রচলিত আচার ব্যবহার অন্তরায় স্বরূপ হইতে পারে; কিন্তু সে অন্তরায় সামান্য। তদুল্লঙ্ঘনে বাস্তবিক কোন হানি নাই।

কোন শিল্প সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সম্পন্ন করার নাম শ্রমবিভাগ। বিশিষ্ট রূপে এই প্রণালী অবলম্বন করায় ইয়ুরোপীয় শিল্পের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যদিও এ দেশীয় শিল্প ও কৃষি কার্য্যে উহার অল্প পরিমাণে প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। এক জন গর্ত্ত করে, এক জন কচা পোঁতে, এক জন কচার গোড়া গাদিয়া দেয়, দুই জনে বাতা বাঁধে ইত্যাদি প্রণালীতে কার্য্য করার নাম শ্রমবিভাগ। ইহাতে অনেক সময় বাঁচে ও শীঘ্র শীঘ্র কাজ হয়।

অষ্টম পাঠ।

কৃষিকার্য্য কি রূপে করিতে হয়।

এ দেশে কৃষি বিষয়ক শাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু জাতির কৃষি শাস্ত্রের মধ্যে মহর্ষি পরাশর প্রণীত এক মাত্র "কৃষি পরাশর" আখ্য কৃষি গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের যে সকল অংশ বর্ত্তমান কৃষি প্রণালীর উপযোগী, আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে সেই সকল অংশের সার সংগ্রহ ও সমালোচন করিব। এ ছাড়া এ দেশে কতক গুলি কৃষি বিষয়ক প্রবাদ, বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সেই সকল প্রবাদও, যথা সাধ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। কারণ অনেক প্রবাদ কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী।

ফলে এ দেশীয় কৃষকগণের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানের কিছু মাত্র চর্চ্চা নাই। তাঁহারা পারম্পর্য্য উপদেশ, আপনাদিগের অভিজ্ঞতা এবং দুই চারিটী প্রবাদ, ইহার সাহায্যেই কৃষি কার্য্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন ভাষাতেই কৃষি বিষয়ক এমন এক খানি পুস্তক নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া যে সে ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিতে পারেন। আবার এ দেশের কৃষকগণ নিরক্ষর বলিয়া কৃষি শাস্ত্রের তাদৃশ প্রয়োজনও ছিল না। সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের প্রতি ভদ্র সমাজের একটু দৃষ্টি পতিত হওয়ায় বঙ্গ ভাষায় কৃষি বিষয়ক কয় খানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় তাহার অধিকাংশ গ্রন্থান্তর, কিম্বা কেবল লোকের বাচনিক উপদেশ হইতে সংগৃহীত। এতাদৃশ পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতায় কৃষি কার্য্য করা যাইতে পারে না। আমি নিজেই উহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ কালে বোধ হয়, যাহা পাড়িলাম, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু সময় কালে তদনুসারে কার্য্য করিয়া উঠা যায় না। এই জন্য আমি এই গ্রন্থে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা সিদ্ধ নিয়ম ও উপদেশ সকলই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি। বোধ হয় ইহার অবলম্বনে অনেকে উত্তম রূপে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আমি স্বয়ং যে সকল নিয়মের পরীক্ষা করি নাই তাহা সত্য কি মিথ্যা, পাঠকগণ পরীক্ষা কালে বুঝিতে পারিবেন। কৃষি বিষয়ক শাস্ত্র হাজার সম্পূর্ণ হইলেও তাহা পাঠ মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাবতীয় শস্যের উৎপত্তি ও হ্রাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা

কর্ত্তব্য। যত দিন পঠিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তত দিন পাকা কৃষক হওয়া যায় না।

এ দেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক দিগকে সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিগত কয়েক বর্ষ হইতে কিছু কিছু যত্ন করিতেছেন। যদি এই সময়ে সরল বঙ্গ ভাষায় কৃষি বিয়ক ২।১ খানি পুস্তক বাহির হয় তাহা হইলে এ দেশীয় কৃষকগণের বাস্তবিক কিছু উপকার হইতে পারে। আমি প্রায় তিন বৎসর কাল পরিশ্রম ও পরীক্ষা করিয়া কৃষি বিষয়ক এই প্রবন্ধটী প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হইতে পারে। আমার বিলক্ষণ ভরসা হয় যে, মনোযোগেব সহিত এই পুস্তক পঠিত হইলে কৃষিকার্য্যে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

কোন সময়ে দেশ প্রচলিত ভাষায় কৃষি বিষয়ে যত গুলি পুস্তক থাকে, উদ্যোগী কৃষকের তৎসমুদয়ই পাঠ ও তল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা করা উচিত। কৃষি শাস্ত্রের ভ্রম নিবন্ধন অনিষ্ট অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা দ্বারাই সে ভ্রমের সংশোধন হইয়া যায়। কোন গ্রন্থের ভ্রমাত্মক নিয়ম যে বার পরীক্ষা করা যায়, সেই বারই কৃষকের কিছু ক্ষতি হইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় বারে কোন ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

পরীক্ষা ক্ষেত্রস্থ শস্যাদির উৎপত্তি ভাল হউক কিম্বা মন্দই হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে সকলই সমান উপকারী। কারণ শস্যাদির উৎপত্তি কি প্রণালীতে উত্তম রূপে হইতে পারে, ইহা জানা যেমন আবশ্যক, কি প্রণালীতে শস্যাদি উৎকৃষ্ট

রূপে হয় না, তাহা জানাও সেই রূপ আবশ্যক। যে গ্রন্থে কৃষি বিষয়ক উপদেশ সংগৃহীত হয়, মনোযোগী কৃষকের পক্ষে চিরকাল তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কৃষি প্রণালী সকল এক বার আয়ত্ত হইয়া গেলে আর গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক হয় না।

হয়ত অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে যে, বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে দুই এক বার মনোযোগ করিলেই যথেষ্ট হয়, সর্ব্বদা তাহার ভাবনা ভাবিতে হয় না। কিন্তু এ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমাত্মক। সর্ব্বদা সচিন্ত, সাবধান, অনলস ও উদ্যোগী হইতে না পারিলে কৃষিকার্য্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। একটী কোন শিল্প সামগ্রী নষ্ট হইয়া গেলে তুমি তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ আর একটী আনিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে, কিম্বা ক্ষতি জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা নিবারণ করিতে পার। কিন্তু শস্য ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ হইবার উপায় নাই। অতএব পাকা পাঁচীর, বেড়া, মাটীর পাট, কঞ্চির ঘেরা ইত্যাদি দ্বারা ফল ফুলের চারা ও শস্যাদি উত্তমরূপে রক্ষা করিবে। যদি বাগানে পাঁচীর কি পাটের সংযোগ করিতে না পার, তাহা হইলে অধিকতর মনোযোগের সহিত প্রতি দিন তত্ত্বাবধান দ্বারা চারাদি রক্ষা করিবে, নতুবা ২। ৪ বৎসরের যত্ন ও পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তে বিফল হইয়া যাইতে পারে।

যে স্থলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কৃষক সাধারণের শিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে বিবিধ শস্যের আবাদ হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ ক্ষেত্র কহে। বিলাতে ঐ রূপ অনেক আদর্শ

ক্ষেত্র আছে। তাহাতে তত্রত্য কৃষকগণের কৃষি শিক্ষার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। এ দেশে ঐ রূপ আদর্শ ক্ষেত্র আছে কি না সন্দেহ। ফলে স্বদেশের মঙ্গল করিবার জন্য যাঁহাদের প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের ঐ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ শত শত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৃষি কার্য্যে যাদৃশ উপকার পাওয়া না যায়, একটী আদর্শ ক্ষেত্রেরকার্য্য দর্শন করিলে সেই রূপ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। যত দিন এ দেশের স্থানে স্থানে আদর্শ ক্ষেত্রের সৃষ্টি না হয়, তত দিন মাঠে মাঠে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া নূতন কৃষককে কার্য্য শিক্ষা করা উচিত। ইহাতেও কিয়ৎপরিমাণে উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

যথাকালে কৃষি বিষয়ক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কৃষককে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত প্রস্তুত থাকিতে হয়। কারণ কৃষির অনেক কার্য্য বাহ্যপ্রকৃতির অবস্থার উপর নির্ভর করে। ঐ অবস্থার সুযোগ পরিত্যাগ করিলে কৃষককে বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনে কর, কুজ্ঝটিকার দিন তামাকের পাটী বা ছালা বাঁধা আবশ্যক। কারণ কুজ্ঝটিকা কালীন আর্দ্র বাতাসে তামাক অতিশয় কোমল হয়, তদবস্থায় বাঁধিলে তামাক ভাঙ্গিয়া ও ঝরিয়া নষ্ট হয় না। আলস্য প্রযুক্ত একটী কুজ্ঝটিকা ত্যাগ করিলে হয় ত সে বৎসর আর কুজ্ঝটিকা না পাওয়ায় তোমাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। এমন সময়ে ছোলা বোনা উচিত যে, দক্ষিণে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কুসুমোদ্গম শেষ হয়; নচেৎ তাল

ফল হয় না। সকল প্রকার শস্যের বীজ যথাকালে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, নতুবা উপযুক্ত সময়ে বপণ বা রোপণের ব্যাঘাত ঘটে। সংগ্রহ সময়ে বীজ সকল উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। কোন্ বীজ নূতন, পুরাতন, ভাল, মন্দ ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া লওয়াই বীজ পরীক্ষা। উত্তম রূপে পরিপুষ্ট নূতন বীজই প্রয়োজনীয়। এমন অনেক বীজ আছে, যাহা বহু বৎসরের পুরাতন হইলেও নষ্ট হয় না। যেমন পলাণ্ডু, শিম, মূলা ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে শস্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

নবম পাঠ।

কৃষিপরাশর।

"কৃষিপরাশর" নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে, এ দেশীয় সর্ব্ব প্রধান শস্য ধানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অনুষঙ্গতঃ এই গ্রন্থে বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাহার সার সংগৃহীত হইবে।

"কৃষিপরাশর" কত কালের গ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের স্বতঃই জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। পরাশরের জীবিত কালানুসারে উহা তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থের প্রথম ঊনত্রিংশটী শ্লোকে গ্রন্থকারের জয় প্রার্থনা, গ্রন্থের মঙ্গল সূচনা, কৃষি-

কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব, কৃষকের গৌরব, অতিথি সেবার উপকার, রাজা, মন্ত্রী, মেঘ, বৃষ্টি, হস্তী, সরীসৃপ, বায়ু ইত্যাদির জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে; ইহাদের ফলাফলই বা কি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে।

এই গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে এই রূপ কথিত হইয়াছে যে, পৌষ মাসকে যদি বার ভাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহার এক এক ভাগে আড়াই দিন করিয়া হইবে এবং প্রত্যেক ভাগকে যথাক্রমে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ইত্যাদি গণনা করিবে। পৌষ মাসের ঐ সকল ভাগের যে যে ভাগে বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে বৎসরের মধ্যে সেই সেই মাসেও বৃষ্ট্যাদির সেই রূপ ব্যবস্থা হইবে। যদি পৌষ মাসের তৃতীয় ভাগে জল হয়, তবে পৌষ হইতে তৃতীয় অর্থাৎ ফাল্গুন মাসেও বৃষ্টি হইবে। যদি অষ্টম ভাগে বৃষ্টি না হয়, তবে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইবে না। এ নিয়ম সত্য হইলে কৃষকগণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। এই নিয়ম যখন যত্ন করিলেই পরীক্ষা করা যায়, তখন উহা নিতান্ত কল্পিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কাল সহকারে বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নহে, এই জন্য বর্ত্তমান কালে উক্ত নিয়ম সকলের ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশতঃ আমার ঐ পরীক্ষা অদ্যাপি শেষ হয় নাই। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পর ঐ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবে।

পৌষ মাসে অতিশয় ধুলা হইলে এবং পশ্চিম দিকে বিদ্যুৎ, কুজ্ঝটিকা বা বৃষ্টি হইলে আষাঢ় মাসে অধিক জল হইবার কথা আছে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে বৃষ্টি কিম্বা মেঘোদয় হইলে, মাঘ এবং ফাল্গুনের শুক্ল সপ্তমীতে, চৈত্রের তৃতীয়ায় এবং বৈশাখের প্রথম দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ, বিদ্যুৎপ্রকাশ কিম্বা বৃষ্টি হইলে সে বৎসর বৃষ্টির অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হয়।

যদি মাঘ মাসে নিরন্তর বৃষ্টি, ফাল্গুনে বায়ু প্রবাহ, চৈত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৈশাখে শিলাপাত ও জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড রৌদ্র হয়, তাহা হইলে বর্ষার প্রারম্ভ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদে রবিবার হইলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঐ দিন মঙ্গলবার হইলে ভাল রূপ বৃষ্টি হয় না; বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবার হইলে সম্পূর্ণ শস্য হয়; এবং শনিবার হইলে সম্পূর্ণ রূপ অবৃষ্টি ও শুকা উপস্থিত হয়।

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে আকাশ মণ্ডল মেঘ শূন্য হয়, তবে শ্রাবণ মাসে ঐ সকল লগ্নে বৃষ্টি হয়। কৃষিপরাশরে ইত্যাদি প্রকার সুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির বহুবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহার পর গ্রন্থকার কৃষি পর্য্যবেক্ষণ, কৃষির উপযুক্ত পশুপালন, সার প্রস্তুত ও ভূমিতে ক্ষেপণ, কৃষির যন্ত্রাদি, প্রথম হলকর্ষণের শুভদিন, হলপূজা, প্রথম কর্ষণের লক্ষণ, মাঘাদি মাসে হলকর্ষণের প্রাশস্ত্য, বীজসংগ্রহ, বপন, রোপণ, কাড়ন, ছেদন, এই গুলি এবং উহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেক গুলি বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। সে সকলের বাহুল্য বর্ণনে তাদৃশ ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া কেবল তৎ

সংক্রান্ত দুই চারিটী কথা সংগ্রহ করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব। কিন্তু উপরি উক্ত অনুষ্ঠান গুলির কোন কোনটী, কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া, অদ্যাপি এদেশীয় কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পিতাকে অন্তঃপুরে, মাতাকে পাকশালায়, আত্মবৎ ব্যক্তিকে গো রক্ষণে নিযুক্ত করিবে, কিন্তু কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ স্বয়ংই গমন করিবে।

যিনি উত্তম রূপে হালিক গোগণকে পালন ও স্বয়ং কৃষি ক্ষেত্র সকল পরিদর্শন করেন, যথাকালে বীজ ও কৃষি কার্য্যোপযোগী বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে কালের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাদৃশ কৃষক নিশ্চয়ই লাভবান হয়েন; তাঁহার কৃষি কার্য্য কখনই বিফল হয় না।

গোশালায় কাঁসার পাত্র, মাচ ও কাঁসার পাত্র ধোয়া জল, কার্পাসের বীজ, তপ্ত মণ্ড, তুষ, সম্মার্জ্জনী, মুষল, ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাখিলে এবং ছাগ বন্ধন করিলে গোরুর অনিষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালে কৃষকগণ লাঙ্গলে যেরূপ ফাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত এবং বিস্তার চারি অঙ্গুলি পরিমিতও নহে। তদ্দ্বারা ভূমি উত্তম রূপে কর্ষিত হয় না। কৃষিপরাশরে ফালের দৈর্ঘ্য এক হস্ত কিম্বা এক হস্ত পাঁচ অঙ্গুলি এবং তাহার আকার আকন্দ পত্রাকার হইবে, এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমি কর্ষণে এই রূপ ফাল ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কিন্তু এই রূপ ফাল ব্যবহার করিতে হইলে অগ্রে গো জাতির উন্নতি বিধান করা কর্ত্তব্য। ঐ গ্রন্থের কোন স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে, বর্ষের প্রথম

জল প্রবাহ কালে গোগণ যদি মল মূত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে মল ত্যাগে শস্য বৃদ্ধি এবং মূত্র ত্যাগে বন্যা হয়। এই নিয়মটীর কোন মূল আছে কি না; কৃষকগণের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বল্মীকের নিকট, গো শালায়, সূতিকাগারে ও রন্ধন-গৃহে শস্যের বীজ রাখিবে না এবং বন্ধ্যা, রজস্বলা, গর্ভিণী নবপ্রসূতি, ও অশুচি ব্যক্তি বীজ স্পর্শ করিবে না। বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই তিন বারে বীজ বপণ প্রশস্ত।

জ্যৈষ্ঠের শেষে কিম্বা আষাঢ়ের প্রথমে তিন দিন অম্বুবাচী বলিয়া খ্যাত, ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার শস্যের বীজ বপণ ও হলাদি কর্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময়ে সচরাচর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াই এরূপ নিষেধের কারণ বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু অধিক জলে বীজের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

মাঘ মাসে গোময় ও সার শুষ্ক করিবে এবং তাহা ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্র নিকটে গর্ত্ত মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে; পরে বীজ বপণ কালে শস্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে(১)। কৃষিপরাশরে শস্য ক্ষেত্রে সার দেওয়ার এই ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এক্ষণে সার দান সম্বন্ধে বহুল মতামত উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের স্থলান্তরে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

---

(১) এই নিয়মটী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সার পর্য্যায়ে ইহার যুক্তি নির্দ্দেশ করা যাইবে।

দশম পাঠ।

কৃষিবিষয়ক প্রবাদ।

বঙ্গদেশে নানা বিষয়ে বহুতর প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে কতক গুলি কৃষি বিষয়ক। ঐ গুলিই এ দেশীয় কৃষিকার্য্যের নেতা। সুতরাং কৃষক মাত্রেরই সেই গুলির সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এই জন্য এই অধ্যায়ে কতক গুলি প্রয়োজনীয় কৃষি বিষয়ক প্রবাদ সংগৃহীত হইল।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক কাঁদে ছাতি,
ঘরে বোসে পুছে বাত
এবার যেমন তেমন আর বার হা ভাত।"

যদি নিরন্তর কৃষি ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া খাটিতে বা মজুরগণকে খাটাইতে না পার, ছাতি মাথায় দিয়া এক এক বার তদারক করিও; নতুবা কৃষি কার্য্যে ক্ষতি হইবে।

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
এলো মেলো বহে বা।
শ্বশুরকে বল বান্ধে আল,
জল হবে আজ কাল।"

কোন্ সময়ে জল হইবে জানিতে পারিলে, কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। এই জন্য কৃষকের মেঘ, বাতাস প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ এই প্রবাদের সঙ্কেতটী স্মরণ রাখা বিধেয়।

"জাওলা তাতে
চাসা মাতে।"

ধানের ছোট ছোট চারায় অধিক রৌদ্র লাগিলে কোন হানি হয় না; বরং উপকার হইয়া থাকে।

"থোড় ত্রিশে, ফুলো বিশে,
ঘোড়া মুখ বার;
ইহা বুঝে, শ্বশুর ঠাকুর
বেচা কেনা কর।"

থোড় হওয়ার ত্রিশ দিন পরে, ফুল হওয়াব বিশ দিন পরে শিষ ঘোড়ামুখের আকারে ঝুলিয়া পড়িলে বাব দিনের পব ধান পাকিয়া উঠে।

"শতেক চাসে মূলা
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান
বিনা চাসে পান।"

মূলার জমিতে অনেক চাস লাগে। পানের জমিতে বেশি চাস লাগে না বটে; কিন্তু সর্ব্বদা ভূমি পরিষ্কার থাকা আবশ্যক এবং উহার লতা প্রস্তুত করার অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান আছে।

"আট হাত অন্তর, এক হাত বাই,
কলা পোঁতগে চাসা ভাই।
কলা পুঁতে না কেটো পাত,
তাইতে কাপড়, তাইতে ভাত।"

কলা পোঁতার গর্ত্ত এক হাত গভীর করিবে। কলা পাত

কাটিলে কলা, মোচা ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও, বোধ হয় পাতা বেচার মূল্যে তাহার পূরণ হইতে পারে। প্রাচীন প্রবাদে কলার পাতা কাটা এক কালে কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু বৃক্ষাদির কতক গুলি শাখা পত্র কাটিয়া না দিলে তাহার ফল মূল উত্তম হয় না, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। তবে কলার বাইলের কিয়দংশ রাখিয়া কাটা উচিত; নতুবা কাণ্ডকোষ পচিয়া গিয়া সমস্ত বৃক্ষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, বোধ হয় এই কারণে এক কালেই কলার পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

"ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি।"

ফাল্গুন মাসে বাঁশের গোড়ায় আগুন দিতে হয়; তাহাতে বাঁশের যাবতীয় অনাবশ্যক শুষ্ক মূল ও গোড়া পুড়িয়া গিয়া ঝাড়ের তেজ বৃদ্ধি করে। চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় পুকুর, ডোবা কিম্বা খাল বিল হইতে পলিমাটী উঠাইয়া দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যথা রীতি এই দুইটী ক্রিয়া করিতে পারিলেই বাঁশের পাইট্ করা হয়। আর তিন বৎসরের ন্যূন বয়সের বাঁশ কাটা উচিত নহে।

"আষাঢ়ে রোয় ফলকে,
শ্রাবণে রোয় দলকে,
ভাদ্রে রোয় তুঁষকে
আশ্বিনে রোয় কিস্‌কে।"

আষাঢ় মাস ধান্য রোপণের প্রশস্ত সময়। ঐ মাসে রোপণ

করিতে পারিলে উত্তম শস্য হয়। শ্রাবণ মাসের রোপণে গাছে পাতা বেশি হয়, ফল তাদৃশ হয় না। ভাদ্র মাসে রোইলে ধানে সার হয় না, ভূঁষ হয়। আশ্বিন মাসে রোইলে কিছু মাত্র শস্য হয় না।

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ;
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"

মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে চাসের বিলক্ষণ সুবিধা হয়, কারণ মাঘ মাস হইতেই জমিতে চাস দেওয়া আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড শীতে ভূমি অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, মাঘ মাসে জল না হইলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া এক রূপ কঠিন হইয়া উঠে।

একাদশ পাঠ।

সার।

সার নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন শস্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সার আবশ্যক। কোন্ শস্যে কি প্রকার সার আবশ্যক, কোন্ মৃত্তিকার সহিত কোন্ প্রকার সার স্বভাবতঃ মিশ্রিত আছে, এবং কোন্ প্রকার মাটীতে কোন্ প্রকার সার দেওয়া প্রয়োজন এসকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। সাহেবদের দেশে যাঁহারা প্রকৃত রূপ কৃষক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক নানা বিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়।

আমাদের দেশে অদ্যাপি সেরূপ প্রথা হয় নাই। সুতরাং মৃত্তিকা পরীক্ষা ও শস্য ক্ষেত্রে সার দান সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা আছে।

এ দেশীয় কৃষকগণের মৃত্তিকার গুণাগুণ বিষয়ে কিছু স্থূল জ্ঞান আছে এই মাত্র। এই জগতের প্রায় যাবতীয় পদার্থই অন্যান্য পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। উদ্ভিদ্‌গণও বিবিধ পদার্থের সমষ্টি। কোন্ উদ্ভিদে কোন্ কোন্ পদার্থ আছে এবং কোথাকার মাটীতে সেই সকল পদার্থের যোগ আছে, তাহা জানিয়া ভূমি বিশেষে শস্য বিশেষ রোপণ করিতে হয়। অথবা যেখানে যে শস্য রোপণ করা যায়, যে জিনিসে সেই শস্যের অংশ আছে, তথায় সেই জিনিস দিতে হয়। শস্যের পুষ্টি জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, ভূমিতে যদি তাহা উপযুক্ত রূপে না থাকে, তবে ভূমির সেই অভাব পূরণ করিয়া দিতে হয়। ভূমির এই রূপ অভাব পূরণের নামই সার দেওয়া। এ দেশে এরূপ বিবেচনা করিয়া সার দেওয়া হয় না; প্রাচীন পরম্পরায় সার দেওয়ার যেরূপ প্রথা আছে, অধুনাতন কৃষকগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। এ গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে ঐ প্রথার সংশোধন এবং কয়েকটী নূতন বিধ সারের উল্লেখ করা যাইবে।

যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃই অনুর্ব্বরা, তাহা যদি কোন রূপে পোড়ান যায় তাহা হইলে বিলক্ষণ উর্ব্বর হইয়া উঠে। কোটা, প্রাচীর, পাকা রাস্তার উপর তৃণ গুল্মাদি যে সতেজে বৃদ্ধি পায়, তাহা সচরাচর দেখা যায়। কারণ মৃত্তিকাতে বালুকা, রসাতিশয্য প্রভৃতি যে সকল

অমুর্ব্বরতা জনক পদার্থ থাকে, অগ্নি সংযোগে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সহকারে তাহারা মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে।

সকল প্রকার শস্যের বীজেই এমন এক প্রকার পদার্থ(১) আছে যদ্দ্বারা তাহার অঙ্কুরের উৎপত্তি ও কিয়ৎ কালের জন্য পুষ্টি হইতে পারে। তবে উৎপত্তি কালে উপযুক্ত রূপ জল, বায়ু ও তাপের সাহায্য আবশ্যক। তজ্জন্য কৃষককে অধিক চেষ্টা করিতে হয় না, যাহাতে বীজ সকল অব্যাঘাতে জল, বাতাস, ও রৌদ্র পায়, কেবল তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। কিয়ৎ কাল পরে যখন অঙ্কুরের মূল মৃত্তিকার রসাদি আকর্ষণে সমর্থ হয়, বোদ মাটী (২) এটেল মাটী ও বালি এই তিনের সম পরিমাণ মিশ্রণে যে মাটী প্রস্তুত হয়, তখন যদি সেই মাটী পায়, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রকার চারাই উৎকৃষ্ট রূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বীজ বপণ বা রোপণের পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে ঐ রূপ মাটী দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সুবিস্তৃত ওষধি ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ঐ রূপ সার মাটী দিতে পারা সহজ নহে। এই জন্য আমরা প্রস্তাব করি, যে সকল স্থানে অধিককাল স্থায়ী ফুল ও ফলের বীজ রোপণ করিতে হইবে, কেবল সেই সকল স্থানেই গর্ত্ত করিয়, ঐ রূপ সার মাটী দেওয়া উচিত। (৩)

---

(১) এলব্যুমেন্ (Albumen)

(২) বোদ মাটীতে অধিক পরিমাণে অঙ্গার অম্ল আছে।

(৩) সকল প্রকার পুরাতন বীজই হুঁকার জল, চুণের জল, কিম্বা শুদ্ধ জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে নেকড়া বাঁধিয়া এক দিন টাঙ্গাইয়া রাখিবে। তার পর ঘুঁটের ছাইয়ের গুঁড়া মাখাইয়া ২।১ দিন রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবে।

শুদ্ধ বালি ও শুদ্ধ কর্দ্দমে অধিকাংশ উদ্‌ভিদই জন্মিতে পারে না। কিন্তু ঐ দুই পদার্থ অন্য মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত হইলে উত্তম সারের কার্য্য করে। কারণ ঐ দুই দ্রব্যে উদ্ভিদের পুষ্টিকর যে যে পদার্থ আছে, তাহা অন্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে অধিক পোষণোপযোগীতা প্রাপ্ত হয়। এমনও দুই একটী উদ্ভিদ আছে যাহারা শুভ্রবর্ণ বিশুদ্ধ বালির উপর জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যথা পাতর কুচি।

জল, চূণ, অস্থি চূর্ণ, খৈল, পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র, পলিমাটী, বোদমাটী ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থকে সার কহিয়া থাকে। কিন্তু এ দেশে কেবলমাত্র জল, গোবর, বোদমাটী এবং কদাচিৎ অল্প পরিমাণে সর্ষপ বা তিসির খৈল সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে প্রায় এমন কোন শস্য নাই, যাহা জল ব্যতিরেকে হইতে পারে। কারণ অম্লজন এবং উদজন এই দুইটী রূঢ় পদার্থের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ দুইটী পদার্থই উদ্ভিদের উপকারী (১)। বিশেষতঃ উদ্ভিদের মৃত্তিকাস্থ অন্যান্য উপাদান জল দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া পোষণোপযোগী হইয়া থাকে। এই জন্য জলই সর্ব্ব প্রধান সার রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু নদী বা কূপাদির জলা পেক্ষা বৃষ্টিবারি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জন্য বড় বড় বৃক্ষের চারা সকল বর্ষা কালে রোপণ করাই প্রশস্ত। যে সকল শস্য বৃষ্টিবারির অপেক্ষা করে না, তাহারা ও বায়ু

(১) ৯ ভাগ জলে ৮ ভাগ অম্লজান এবং এক ভাগ উদজান আছে।

মধ্যগত বাষ্পজাত শিশির প্রচুর পরিমাণে না পাইলে বাঁচিতে পারে না। শিশির ও বৃষ্টি বারির উপাদান একই প্রকার।

চূণ ও হাড়ের কুচি সকল প্রকার শস্যে আবশ্যক হয় না। যদি আটাল মাটীতে কোন রূপ শস্য জন্মান আবশ্যক হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ দুই সার দিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ঐ দুই সারে মৃত্তিকাকে শিথিল করিয়া রাখে। হাড়ের কুচি ইক্ষু ও চা ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী। এখন সর্ব্বত্রই ইউরোপীয় দিগকে গবাস্থি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। তাহার অধিকাংশই চূর্ণীকৃত হইয়া চা ক্ষেত্রে প্রেরিত হয়।

চূণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদের কোন উপকার করে না, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চারি প্রকারে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

১। মৃত্তিকাকে শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া উদ্ভিদ্ মূল প্রসারণের উপযোগী করে।

২। মৃত্তিকাস্থ অম্ল সকল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটীত পদার্থ সকলকে কোমল করিয়া দেয়।

৩। মৃত্তিকাস্থ রস পরিমাণের লাঘব করিয়া পোষক পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়।

৪। খণিজ পদার্থ (১) প্রভৃতির ক্ষয় সাধন করে।

প্রায় সকল প্রকার শস্যেই খৈলের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ দেশে কেবল ইক্ষু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে খৈল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাহাও আবার সর্ষপ

---

(১) যে সকল খণিজ উদ্ভিদের অনিষ্ট করে।

কিম্বা মসিনা খৈলই অধিক, রেড়ির খৈল অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সর্ষপ ও মসিনা অপেক্ষা রেড়ি, পোস্ত কার্পাস বীজ ইত্যাদির খৈলই কৃষি কার্য্যে বিলক্ষণ উপযোগী। গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ কৃষকেরা গোল আলুর চাসে রেড়ির খৈল ব্যবহার করে; এই জন্য তাহাদের আলু অধিক বড় বড় হয় এবং উৎপন্নও এদেশ অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় অন্যূন এক মন খৈল দেওয়া আবশ্যক। শস্য ক্ষেত্রে খৈল এরূপে ছড়ান উচিত যেন অধিক মাটীর নীচে না যায়। সর্ব্ব প্রকার খৈলই যে সারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহার কারণ এই, খৈলে পটাস, ম্যাগ্‌নেসিয়া, চূণ, ফসফরিক-অম্ল যবক্ষার জান ইত্যাদি বহুবিধ রূঢ় পদার্থের সংযোগ আছে। ঐ সকল রূঢ় পদার্থ প্রায় সমস্ত উদ্ভিদেরই পুষ্টিকর (১)।

---

(১) কোন পদার্থ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং অবশিষ্ট ভস্মাকার ধারণ করে। দগ্ধ পদার্থের যে ভাগ বায়বাকার প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে অম্লজান, উদজান, অঙ্গার অম্ল ও যবক্ষার জানই অধিক। ঐ সমস্ত গুলিই উদ্ভিদের উপকারী এবং উদ্ভিদগণ ঐ সকল পদার্থ প্রায়ই বায়ু হইতে গ্রহণ করে। ভস্মে পটাসাদি বহুবিধ উদ্ভিদ্ পোষণ পদার্থ থাকে। যদি সরিষা, তিসি, পোস্ত দানা এবং কার্পাস বীজ এই কয়টী শস্যের খৈলের প্রত্যেকের ৬।০ মণ দগ্ধ করা যায়, তাহাহইলে গড়ে প্রত্যেকের ।৬৶ সের ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। ঐ পরিমিত ভস্মে গড়ে /৪।০ সের পটাস, /১।৶ ম্যাগ্নেসিয়া, /২॥৶ চূণ এবং /৬॥৶ ফস্ফরিক অম্ল থাকে, ইহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

গোধুম, যব, ধান্য, সর্ষপ, তিসি, ছোলা, কলায় ও মসুর এই শস্যগুলির প্রত্যেককে উপরিউক্ত পরিমাণে দগ্ধ করিলে গড়ে তাহাদের /৭॥ সের ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। ঐ ভস্মে গড়ে পটাস /৫॥, ম্যাগ্নেসিয়া /৬, চূণ /॥ এবং ফস্ফরিক অম্ল /৩ সের পাওয়া যায়। খৈল যে কেন সার রূপে ব্যবহৃত হয় এই হিসাব দৃষ্টে তাহা সহজেই বোধ হইবে।

পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র হইতে যে সকল সার জন্মে তাহা সকল প্রকার শস্যেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। মনুষ্যের মল মূত্র জাত সারই সর্ব্ব প্রধান, "পরে পক্ষী, তার পর মেষ, শূকর, ঘোড়া ও সকলের পরে গোরুর (১)।" মেষের বিষ্ঠাপেক্ষা গোরুর বিষ্ঠা নিকৃষ্ট সার হইবার যুক্তি ভাল বোঝা যায় না। কারণ গোরুর ও মেষের প্রত্যেকেরই চারিটী পাকস্থলী এবং অন্যান্য শারীর প্রকৃতি ঠিক এক রূপ। বিশেষতঃ গোময় জাত সারে এ দেশীয় প্রায় যাবতীয় শস্যই উত্তম রূপে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অথচ রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, অশ্ব, শূকর ও মেষ ইহাদিগের বিষ্ঠাপেক্ষা গোময়ের দাহ্যভাগে যবক্ষারজান পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। জন্তুর মল মূত্রের অন্তর্গত ঐ যবক্ষারজান পদার্থই উদ্ভিদের বিশেষ ইষ্টকর। কিন্তু গোময়ের ভস্মে অঙ্গার অম্ল, পটাস, ম্যাগ্নিসিয়া, চূণ, অস্থিসার প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পোষণ প্রায় সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে। মনুষ্যের মল মূত্র জাত সার প্রস্তুত করা কিম্বা ভূমিতে দেওয়া দূরে থাকুক, উহার আন্দোলনেও আমরা ঘৃণা বোধ করি। এই ঘৃণা যে কেবল অমাদের অজ্ঞতা মূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে লোকে এ বৎসরে মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে আর বৎসর বড় বড় বেগুন ও মূলা তৈয়ার হইতেছে। তাহা কি আমরা খাই না? তবে মল মূত্র

(১) এই সকল প্রাণীর মল ও মূত্রের সহস্র ভাগে যথাক্রমে নিম্ন লিখিত পরি যবক্ষার জান আছে, মনুষ্য...১৪...১০ শূকর...৬...৩ মেষ...৭...১৪ অশ্ব...৫...১২ গো...৩...৮।

জাত সারে ঘৃণা কেন? মনুষ্যের মল মূত্র জাত সার হইতে উৎপন্ন শস্য সকল, যখন সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়, তখন কৃষি কার্য্যে তাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার (১) ব্যবহার করিতে বিমুখ থাকা কাহারই উচিত নহে।

অনেক জেলখানায় পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে মল মূত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা অতি উৎকৃষ্ট সার। এখানকার কৃষকেরা যে জমিতে আবাদ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা মধ্যে মধ্যে দুই এক বৎসর, সকলকে যদি মল ত্যাগার্থ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হয়। পশ্চিম দেশে এ প্রথা প্রচলিত আছে; তত্রত্য কৃষকেরা আপন আপন আবাদি জমিতে মল মূত্র ত্যাগার্থ যত্ন পূর্ব্বক অন্যান্য লোক দিগকে আহ্বান করে। লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরা মিউনিসিপ্যাল কমিসনারদিগের নিকট হইতে পায়খানার মল ক্রয় করিয়া আপনাদিগের ক্ষেত্রে দেয়। ঠিক এরূপ ব্যবহার এদেশে কোন কালেই প্রচলিত হইবে কি না বলা যায় না। তবে ক্ষেত্রে মল ত্যাগ করানর প্রথা সহজেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। দুই এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখার প্রথা থাকায়, ঐ উদ্দেশ্যটী কার্য্যতঃ কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু মল শুষ্ক মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত না হইলে বিশেষ ফল হয় না। পক্ষী, মেষ, ঘোড়া, ও শূকর ইহাদিগের মল মূত্রে যে, উৎকৃষ্ট

---

(১) মনুষ্যের বিষ্ঠায় যবক্ষার জান পদার্থ বা য়্যামোনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহাতে অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভিদ পোষণ পদার্থও আছে। এই জন্যই উহা উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য।

সার প্রস্তুত হইতে পারে, বোধ হয়, এ দেশীয় কৃষকগণ আদৌ তাহা অবগতই নহেন। কোন কোন দ্বীপ ও পর্ব্বত বাসী গুয়েনো নামক সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের মলে এমন উৎকৃষ্ট সার (১) প্রস্তুত হয় যে, ইউরোপীয় কৃষকগণ বার্ষিক কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা আনিয়া স্বদেশস্থ কৃষি ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকে। চূর্ণ ঘটিত লাবণিক পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকায় পক্ষিমলে এত উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কিন্তু এদেশের কোন্ কোন্ পক্ষীর মলে সার হইতে পারে, তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

পলিমাটী ও বোদ মাটী এই দ্বিবিধ পদার্থই সকল প্রকার শস্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে। যে জল চতুর্দ্দিকের ভূমি ধৌত করিয়া কোন নিম্ন স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে, তাহার নিম্নে যে মাটী সঞ্চিত হয়, তাহাকেই পলল বা পলিমাটী কহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদেরই তেজ বৃদ্ধি করে। গঙ্গার পূর্ব্ব পারস্থ নদীয়া ও ২৪ পরগনার কৃষকেরা কেবল মাত্র পলিমাটী দ্বারা উত্তম রূপে গোল আলু ও কপি প্রস্তুত করিয়া থাকে। পলল দুই প্রকার, মাটী ও বালি। পদ্মার প্লাবনেই অধিক বালি থাকে। কৃষি কার্য্যে আরও এক রূপ মৃত্তিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষার মাটী কহে। গোরু ও ঘোড়ার মল একত্র মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া ও পচিয়া ঐ মাটী তৈয়ার হয়।

---

(১) গুয়েনোর মলকে গুয়েনো কহে। শত ভাগ গুয়েনোর ১৫ ভাগ যবক্ষার জান আছে।

কূপ বা পুষ্করিণী খনন কালে ৫। ৬ হাত মাটীর নিম্নে একটী কালো মৃত্তিকার স্তর দেখা যায়, তাহাকেই বোদ মাটী কহিয়া থাকে। উদ্ভিদ সকল বহুকালে পচিয়া ঐ রূপ মৃত্তিকা হইয়া যায় (১)। বোদ মাটী উদ্ভিদ্ পচিয়া হয় বলিয়াই উহা উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সকলেই অবগত আছেন যে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার ধারে তোলা মাটীর উপর যে বাগান করা যায়, তাহার বৃক্ষাদি অতি সতেজ হইয়া থাকে; বোদ মাটীই তাহার কারণ।(২) বোদ মাটীর প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন উদ্ভিজ্জগণ উত্তমরূপে না পচিয়া গিয়াছে, তখন উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না, বরং কিছু অনিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মাটী দিলে গাছের গোড়ায় উই ধরে।

অতঃপর দুই প্রকার মিশ্র সারের উল্লেখ করা যাইবে। গো মূত্র, খৈলের গুঁড়া এবং যেখানে গোবর পচে তথাকার মাটী একত্র মিশাইলে উত্তম সার হয়। সকল প্রকার জন্তুর প্রস্রাব কিছু দিন পচাইয়া চতুর্গুণ জলের সহিত মিশাইলে শিথিল মাটীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হয়। (২)

মাঘ ও ফাল্গুন মাসই সার দিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু যে সকল ভূমিতে হৈমন্তিক শস্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে ভাদ্র মাসের শেষে সার দেওয়া উচিত। কারণ হৈমন্তিক শস্যের প্রায় সমস্তই আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসের মধ্যে

---

(১) এই প্রণালীতেই মৃদঙ্গার স্তর নির্ম্মিত হয়।

(২) পচা বস্তু মাত্রেই অধিক পরিমাণে অঙ্গার অম্ল ও ক্ষার জন্মে থাকে। এই জন্যই পচা বস্তু সকল সারের কার্য্য করে।

বপণ বা রোপণ করিতে হয়, মাঘ ফাল্গুনে সার দিলে প্রবল বর্ষায় তাহা ধৌত হইয়া যাইতে পারে।

ইয়ুরোপের কৃষকেরা যেরূপ প্রণালীতে সার রক্ষা করেন এবং তদর্থ যেরূপ যত্ন ও যেরূপ ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, এদেশীয় কৃষকেরা সারের জন্য ততদূর করিবার প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। এদেশীয় ভূমির অবস্থা এক কালে এরূপ ছিল, যখন সারের জন্য তাদৃশ যত্ন না করিলেও চলিত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন উপযুক্ত সার যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিতে প্রদান না করিলে, পর্য্যাপ্ত শস্যাদি লাভের উপায়ান্তর নাই। এই জন্য সার রক্ষা করিবার একটী সহজ উপায় প্রস্তাবিত হইতেছে। এদেশীয় কৃষকেরা বাটীর নানা স্থান হইতে গোবর ও ওঁচলা মাটী কুড়াইয়া সার রূপে শস্য ক্ষেত্রে প্রদান করেন। সে সারের অধিকাংশ উদ্বায়ী প্রয়োজনীয় পদার্থ (১) নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সার মাটী প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্য একটু যত্ন করা আবশ্যক। সার মাটী বলিলে, গোবর, ভস্ম গোমূত্র, তৃণপত্র, ভূমির উপরিস্থ মৃত্তিকা ইত্যাদি একত্র মিশ্রিত ও গলিত হইয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই সার, সকল শস্যের পক্ষেই উপকারী এবং অন্যান্য সারাপেক্ষা অধিক সুলভ। এই সার প্রস্তুত করিবার জন্য গোশালার নিকটে ৫। ৬ হাত গভীর কূপের ন্যায় একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। গোশালার যাবতীয় গোমূত্র উহাতে গড়াইয়া আসিতে পারে, এই জন্য গোয়া-

(১) যবক্ষার জান, অঙ্গার অম্ল ইত্যাদি।

লের মেজ্যা হইতে সংযুক্ত করিয়া একটী নালা কাটিয়া রাখা আবশ্যক। প্রতিদিন ঐ গর্ত্তে গোবর, ভস্ম, গোয়াল ও উঠান ঝাঁইট দেওয়ার আবর্জ্জনা নিঃক্ষেপ করিবে এবং উহাতে জল না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিবে (১)। ইহাকে "সারকুড়" কহা যাইতে পারে। পরে যথা কালে ঐ গর্ত্ত হইতে সার মাটী তুলিয়া শস্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া জমিতে চাস দিবে। এই মাটী শস্য বপণের কিছু কাল পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রদান করিলে বায়ু হইতে উদ্ভিদ্ পোষণ কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করিবার অবসর পায়। কিন্তু ঐ মাটী হইতে আবার কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেও পারে। বোধ হয় এই কারণেই "কৃষি পরাসারে" সার মাটী ক্ষেত্রের নিকট পুঁতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

সারের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। জল......ইহা সমস্ত শস্য ও উদ্ভিজ্জে প্রয়োজনীয়। সকল প্রকার ভূমিতেই জলের প্রয়োজন। জল, শস্যাদি রোপণ ও বপণের পূর্ব্বেও দিতে হয়, পরেও দিতে হয়।

---

(১) ইয়ুরোপের কোন কোন কৃষকে গো ও অশ্ব শালার মধ্যেই সার ছড়াইয়া রাখেন। তাহা ক্রমাগত পশুগণের পদাঘাতে জমাট বাঁধিয়া যায়। ঐ সারের বেধ কখন কখন চারি ফুটেরও অধিক হইয়া থাকে তাহাতে পশুগণের কোন অনিষ্ট হয় না; অথচ সার উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকে। যাঁহারা সার স্তূপাকার করিয়া রাখেন, তাঁহারা উহার উপর এমন সকল পদার্থের আবরণ প্রদান করেন, যাহাতে সারের কোন হানি হয় না। কোন কোন স্থলে প্রায় "সার কুড়ের" প্রণালীতেই রাখা হইয়া থাকে।

শাক কিম্বা ফল ফুলের চারায় জল দিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত যেন জলের বেগে গোড়া বাহির হইয়া না পড়ে। ইহা উদ্ভিজ্জের মূলে ও সর্ব্বগাত্রে দেওয়া উচিত। ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে না। কখন অধিক, কখন অল্প জলের প্রয়োজন হয়। তবে কৃষককে সতর্ক ভাবে দেখিতে হয় যেন জলাভাবে কিম্বা জলের আধিক্যে বৃক্ষাদি না মরিয়া যায়। ইহার মূল্য প্রায় লাগে না; তবে সময় ও স্থল বিশেষে জলের খাজনা ও জল সেচিবার মজুরি কিয়ৎ পরিমাণে লাগিয়া থাকে।

২। চূণ......যে সকল জমিতে অধিক আগাছা জন্মে এবং সহজে নষ্ট হয় না, সেই সকল জমিতে চূণ দিতে হয়। ইহা বপণাদির অনেক পূর্ব্বে চূর্ণাবস্থায় জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি ১০। ১৫ সের চূণ লাগে; উহার মূল্য ।৵ হয় আনার বেশি নহে। অধিক পূর্ব্বে ভূমিতে চূণ না দিলে উহার ঝাঁজে ভাল শস্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৩। অস্থি চূর্ণ......ইহা আটাল মাটীর বিশেষ উপযোগী। বপণাদির অনেক পূর্ব্বে দিতে হয়। সচরাচর ইক্ষু ক্ষেত্রে এই সার দেওয়া হয়। ইহার পরিমাণ ও মূল্যের নির্ণয় হইতে পারে না। হাড় কুড়াইতে এবং বড় বড় হাড় ভাঙ্গিয়া কুচি করিতে কিছু খরচ পড়ে। বোধ হয় এক টাকা ব্যয়েই এক বিঘা জমিতে হাড়ের কুচি দেওয়া হইতে পারে।

৪। খৈল......ইহা গুঁড়া করিয়া আলু, কোপি, পাট, ইক্ষু ইত্যাদির জমিতে বপণাদির পূর্ব্বে ও পরেও মধ্যে

মধ্যে দিতে হয়। খৈল মাটীর অধিক নীচে না পড়ে। প্রায় সকল প্রকার ভূমিতেই খৈল দিতে পারা যায়। ইহা নানা প্রকার। প্রতি বিঘায় অনূ্যন ১/০ মণ লাগে। তাহার গড়মূল্য ১৲ টাকা।

৫। গোবর·····ধান্য, রাঙ্গাআলু, শাঁক আলু, পাট, ইত্যাদির ভূমিতে দেওয়া যায়। গোবর পৃথক স্থানে পচাইয়া শুষ্ক করত বপণাদির পূর্ব্বে জমিতে দিতে হয়। ঢাল জমিতে গোবর রাখিলে তাহার যে রস গড়াইয়া আসে, সেই রস চারা গাছের গোড়ায় দিতে হয়। প্রতি বিঘার ২০/ মণ গোবর লাগে। উহার মূল্য ।।০ আট আনা এবং ইহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া ক্ষেত্রে দিতেও আর ।০ চারি আনা খরচ পড়িতে পারে।

৬। অন্যান্য পশুর মল......অশ্বের মল বাঁশ, নারিকেল, খেজুর, গুপারি ইত্যাদির মূলের কিঞ্চিৎ নিম্নে দিতে হয়। মেষ, ছাগ, শূকর ইত্যাদির মল যে সে শস্যের ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ঐ সকল মলের ২ মণ হইতে ৪ মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। উহা বপণাদির পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিবার কালে দিতে হয়। উহার খরচ বিঘা প্রতি বোধ হয় ১৲ এক টাকার বেশি পড়ে না।

৭। মূত্র......সকল প্রকার জন্তুরই মূত্র উত্তম সার। কিন্তু উহা পৃথক স্থানে অনেক দিন পচাইয়া চতুর্গুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া চারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ঢালিয়া দিতে হয়। প্রতি গাছের গোড়ায় /৷৷০ সের হিসাবে দিলে বিঘায় ১৲ এক টাকা খরচ পড়িতে পারে।

৮। পলিমাটী······আলু, কোপি, তামাক, মূলা, শাঁক আলু, কচু প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট শস্যে দেওয়া যায়। বপণাদির অনেক পূর্ব্বে দিতে হয়। এই সারের মূল্য প্রায়ই দিতে হয় না। ক্ষেত্রের নিকটস্থ বিল খালাদি হইতে তুলিয়া লইতে পারিলেই হয়। ন্যূনাধিক ২৲ দুই টাকা খরচ করিলে যত মাটী উঠিতে পারে, এক বিঘা জমির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

৯। বোদমাটী······আম্র, কাঁটাল, নারিকেল, নিচু, কলা কার্পাস ইত্যাদি যাবতীয় বড় বড় বৃক্ষাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষাদি রোপণের পূর্ব্বেই এই সার দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হয়। বিঘা প্রতি ইহার পরিমাণ পলি মাটীর অপেক্ষা অল্প, কিন্তু খরচ উহারই তুল্য।

১০। ঘাস মাটী······ইহা প্রায় সর্ব্ব প্রকার শাক ও শস্যের পক্ষেই উপযোগী। ক্ষেত্রে দেওয়ার নিয়ম ঠিক গোবরের সারের ন্যায়। বিঘা প্রতি ১০ মণ হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু উহার খরচ প্রায় তিন টাকা পড়ে।

১১। ছাই······তামাক, ধান, মানকচু ইত্যাদি শস্যে দিতে হয়। তামাক ও ধানের জমিতে অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বেই দিতে হয়। মানকচুর গাছ যত বড় হইবে, ততই উহার গোড়ায় ছাই উঁচু করিয়া দিতে হয়। উহার মূল্য প্রায়ই লাগে না; বাড়ী হইতে ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে যে কিছু খরচ পড়ে। তবে ছাই গুলি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ না করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখা আবশ্যক।

১২। লবণ বা সোরা······অন্যান্য সারের সহিত মিশ্রিত

করিয়া তামাকের জমিতে বিঘা প্রতি ৫। ৬ সের পরিমাণে দিতে হয়।

দ্বাদশ পাঠ।

পাইট্।

উদ্ভিদেব উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ ও আলোক এই গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সকল পদার্থের (১) সাহায্যে উদ্ভিদ্ জন্মিতে ও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, জল, বায়ু ও মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থ আছে বটে; কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থকে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী করা যায় এবং উদ্ভিদ্ সকল উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার নাম পাইট।

এদেশে বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে যত বৃষ্টি পতিত হইয়া ভূমিকে রসাইয়া ফেলে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ভূমিতে সেই রস থাকে। এই জন্য কোন নূতন ভূমিতে শস্যাদি জন্মাইতে হইলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সেই ভূমি কোদাল দ্বারা কাটিতে হয়। এই সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাব না থাকায়, ভূমির উপরিস্থ ঘাস ও আগাছা সকল

---

(১) অম্লজান, অঙ্গার অম্ল, যবক্ষার দ্রাবক, এ্যামোনিয়া, উদজান, পটাস, ম্যাগ্নিসিয়া, ফসফরিক অম্ল, চূণ, সোডা ইত্যাদি।

মাটীর নীচে পচিয়া ভূমির তেজ বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত শীত কালের শিশির সেই মাটীর সহিত মিশিয়া মাটীকে কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল ও উর্ব্বর করিয়া দেয়। তাহার পর যখন জল হইবে, তখনই "যো" দেখিয়া জমিতে চাস দিবে। যখন মৃত্তিকার এরূপ অবস্থা হয় যে,তাহাতে রস আছে,অথচ খনন কালে লাঙ্গল কিম্বা কোদালে মাটী জড়াইয়া লাগে না, মাটীর তাদৃশী অবস্থাকে "যো" কহে।

জল উদ্ভিদের পক্ষে এত উপকারী, তথাপি মূলে জল বসিলে গাছের অনিষ্ট হয়। এই জন্য যাহাতে তরু মূলে জল বসিতে না পায়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে যখন তরুমূলে জল সেকের প্রয়োজন হয়, তখন বিবেচনা পূর্ব্বক জল দেওয়া উচিত। পূর্ব্বাহ্ণ কিম্বা অপরাহ্ণ ভিন্ন অন্য সময়ে জল দিলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্ক মৃত্তিকায় জল শোষিত হইয়া মাটী যে সরস হয়, উদ্ভিদ, মূল দ্বারা সেই রস পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা বা পত্রে জল দিলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পত্রে জল দেওয়ায় বিশেষ উপকার হয়, কারণ পত্রই উদ্ভিদের প্রধান ইন্দ্রিয়। জল দ্বারা উহার উপরিস্থিত ধূলি ধৌত হইয়া উহার গাত্রস্থ ছিদ্র সকল পরিষ্কৃত ও উহা দ্বারা বায়ুস্থ পোষক পদার্থ (১) শোষিত হইয়া থাকে।

জল উদ্ভিদ পোষণ দ্রব্য সকলকে তরল করিয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়। জল গাছের নিতান্ত গোড়ায় না

(১) অঙ্গারায়, য়্যামোনিয়া ও উদজান ইত্যাদি।

দিয়া একটু দূরে দিতে হয়, কারণ গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল সকল একটু দূরে থাকে এবং সেই সকল মূলই মৃত্তিকার রস শোষণে অধিক সক্ষম। তদ্ব্যতীত অধিক মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যে জল আসে, তাহা উদ্ভিদের অধিক পুষ্টিকর। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল সকল দূরে থাকে বলিয়া গাছ, এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিবার কালে, পাছে ঐ সকল সূক্ষ্ম মূল নষ্ট হয় বলিয়া গোড়ায় বেশি মাটী রাখিতে হয়। যখন কোন গাছ, স্থানান্তর করিবার জন্য তুলিতে হয়, তখন চারিদিক যেমন খুঁড়িবে, শুক্না কলার খোলা কিম্বা চট্ দ্বারা অমনি মাটী শুদ্ধ গোড়া বাঁধিতে থাকিবে। এই রূপে মাটীর ভিতর হইতে গোড়া বাঁধিয়া তুলিলে সে গাছ কখনই মরিবে না। বর্ষা, শ[illegible] ও বসন্ত এই তিন ঋতুতেই উদ্ভিদ স্থানান্তর করা যাইতে পারে। শরতে স্থানান্তরিত বৃক্ষাদি বাড়ে না, যেমন তেমনিই থাকে। অনেকে মনে করেন যত বেশি গর্ত্ত করিয়া চারা পোতা যায়, ততই ভাল; কিন্তু সেটী ভুল মূলের সীমা অতিক্রম করিয়া গাছ পুঁতিলে অধিকাংশ উদ্ভিদের অনিষ্ট হয়।

জমিতে চাস দিলেই মাটী আলগা হইয়া শুকাইতে থাকে। ঐ শিথিল মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়। মাটী যত শুষ্ক হইতে থাকে, বায়ু মধ্যস্থ উদ্ভিদের পোষণোপযোগী বিবিধ পদার্থের (১) সহিত বায়ুর রস শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা ততই আকৃষ্ট হইতে থাকে। শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা জলও বায়ুস্থ পদার্থ সকল আকৃষ্ট হওয়াই, মৃত্তিকার স্বাভাবিক

(১) অম্লজান, উদজান, য়্যামোনিয়া, জল, যবাক্ষর দ্রাবক।

উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক অদ্বিতীয় কারণ। এই জন্য, ভূমি যাহাতে উত্তম রূপে শুকাইতে পায়, কৃষকের তৎপক্ষে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই কারণেই উদ্ভিদের মূল মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। নিড়ান, কাড়ান, বিদা দেওয়া প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। বৃক্ষ সকল মূল দ্বারা বায়ু হইতে যেমন নানাবিধ পদার্থ শোষণ করিয়া আপনার পুষ্টি সাধন করে, পত্র ও ত্বক্ দ্বারাও বায়ু হইতে কোন কোন পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে (১)। ইহা ব্যতীত প্রাণী সদৃশ, উদ্ভিদেরাও, পত্র ও ত্বকৃস্থিত ছিদ্র দ্বারা বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে গাছের গোড়ায় এবং সর্ব্বাঙ্গে উত্তম রূপে বাতাস লাগিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বর্দ্ধন বিষয়ে উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাপ বায়ু কর্ত্তৃক শিথিল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া উদ্ভিদের উপকার করে। কতক গুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর বা কুসুমোদ্গম হইতে বীজের পরিপক্বাবস্থা পর্য্যন্ত। অতি অল্প পরিমিত তাপের প্রয়োজন হয়, কতক গুলি উদ্ভিদের জীবন ও বর্দ্ধন বিষয়ে অত্যধিক তাপ আবশ্যক এবং আর কতক গুলির পক্ষে এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী তাপের প্রয়োজন হয়। উষ্ণ মৃত্তিকাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি

(১) উদ্ভিদগণ মূল ও পত্রাদি দ্বারা বায়ু হইতে অঙ্গারম্ল বায়ু গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ অম্লজান ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র অঙ্গার গ্রহণ করে। অঙ্গারই উদ্ভিদের প্রধান উপাদান।

বিষয়ে বিশেষ উপকারী। কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্তিকা সচরাচর অধিক তাপ আশোষণ করে, এই জন্য উক্ত বিধ মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্ উত্তম রূপে বৃদ্ধি পায়। বীজের উপরি ভাগ পচিয়া ও ফাটিয়া যে, অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা তাপেরই কার্য্য। তাপ ভিন্ন বৃক্ষ মূল, মাটী হইতে উত্তম রূপে রস শোষণ করিতে পারে না। কারণ উত্তাপ লাগিলে বৃক্ষের পত্র ও ত্বক্ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ রস বাষ্পাকারে নির্গত হয়। তাহাতেই উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক রসের পরিপাক হয়। পত্রাদি দ্বারা যত অধিক পরিমাণে বাষ্প নির্গত হয়, মূল দ্বারা ততই মৃত্তিকারস আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদের পোষণ করে। অতএব যাহাতে উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে উত্তম রূপে তাপ লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে কৃষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। "আওতায়" যে, গাছ পালা ভাল হয় না। ইহাও তাহার একটী কারণ। আমাদের সংস্কার আছে, হলুদ, আদা, আনারস প্রভৃতি "আওতা" ভিন্ন হয় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঐ সকল গাছ আওতায় হইতে পারে, কিন্তু অনাবৃত স্থানে তদপেক্ষা ভাল হয়। যদি এমন বুঝা যায় যে, উত্তাপের অল্পতায় কোন উদ্ভিদের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে এরূপে উহার গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত যেন মূলে রৌদ্র লাগিতে পারে। আর ঐ উদ্ভিদের কতক গুলি পত্র নষ্ট করিয়া দিবে। এক মাস এই রূপে রাখিয়া মূল সার পূর্ণ করিয়া জল সেচন করিবে। আর যদি তাপের আধিক্যে অনিষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে গোড়ায় অধিক পরিমাণে মাটী ও খড় দিয়া জল সেচন করিবে।

আলোক (১) ভিন্ন উদ্‌ভিদ্‌ রসের পরিপাক, উহাতে কাষ্ঠ সংস্থান এবং উহার মধ্যে রস সঞ্চারাদি কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয় না। অন্ধকারে কেবল সুন্দর রূপে অঙ্কুর নির্গত হইতে পারে। অনেকে দেখিয়াছেন, যে সকল তরু কিম্বা লতা আলোক পায় না তাহারা শাদা ও অশক্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে উদ্‌ভিদ্‌ গণ বিশিষ্ট রূপে আলোক পায়, তাহারউপায় করা উচিত। যে সকল বৃক্ষ আলোকে উৎপন্ন হয় না, তাহা জ্বালানির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। আলোকের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ বিচিত্র। সকল উদ্ভিদ্‌ই যে উর্দ্ধ গমন করিবার চেষ্টা করে আলোকের স্পর্শই তাহার কারণ।

যদি তরু কিম্বা লতায় অধিক পরিমাণে শাখা ও পত্র থাকে, তাহা হইলে গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি জন্মিতে বিলম্ব হয়। এই জন্য কতক গুলি অনাবশ্যক শাখাদি কাটিয়া দেওয়া উচিত। কয়েকটী মাত্র পত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ডাল, পাতা ও ফুল ভাঙ্গিয়া না দিলে তামাক ত হইতেই পারেনা। এই রূপ কার্য্য দ্বারা উদভিদ্‌ শীঘ্র সতেজে বাড়িয়া উঠে।

শস্য ক্ষেত্রের চারা সকল অতিশয় ঘন হইলে উপযুক্ত রূপ বায়ু আলোকাদির অভাবে ক্ষেত্রের অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্য কতক গুলি গাছ মারিয়া ফেলা উচিত।

---

(১) আলোকে অম্ল অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার ও অম্ল জান পৃথক্‌ হইয়া থাকে। আলোক ভিন্ন উদ্ভিদ্‌ হরিত বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। অম্ল অঙ্গারক বাষ্পের উক্ত বিধ বিভাগ রাত্রে হয় না।

কৃষকেরা বিদা, বাঁশি প্রভৃতি দ্বারা ধান্য ক্ষেত্রে ঐ কার্য্য করিয়া থাকে।

কোন তরু কিম্বা লতাদি, শাখা পল্লবে অধিক সতেজ হইয়াছে, অথচ ফুল ও ফল হইতেছে না, এমন অবস্থায় কোন শাখার এক স্থান অল্প পরিমাণে ছেঁচিয়া কিম্বা মচকাইয়া দিলে, ঐ শাখায় অচির কাল মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে। যে গাছে বেশি ফল হয়, তাহার কতক গুলি ফল ভাঙ্গিয়া দিলে, অবশিষ্ট গুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও সুস্বাদ হয়।

উদ্যান বা শস্য ক্ষেত্রে যাহাতে পাতাল কোঁড়, বেঙের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ না জন্মে তদ্বিষয়ে কৃষকের দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ ভূমিতে উদ্ভিদের পোষণ কারী যত প্রকার সামগ্রী থাকে, উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ তাহার সমুদায়ই আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এই জন্য ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

ত্রয়োদশ পাঠ।

প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কি রূপ ?

ধান্য, কার্পাস, নীল, তুঁত, ইক্ষু, খর্জ্জুর, পাট, আলু, হরিদ্রা, আদা, পলাণ্ডু, তামাক, ইত্যাদি এদেশের প্রধান লাভ জনক শস্য। ভারতবর্ষে যত প্রকার শস্য আছে,

সমস্তেরই আবাদ প্রণালী ও লাভের হিসাব এ গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যে সকল শস্যের আবাদ ও লাভের হিসাব এ দেশে সাধারণতঃ জানা নাই, এ গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহাদিগেরই বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

ক—পাঠ।

খর্জ্জুর।

সকলেই জানেন খেজুর গাছে লাভ আছে। লোকের বাড়ী, বাগানে, পুষ্করিণীর ধারে আপনিই খেজুর গাছ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বা দুই চারিটী খেজুরের বাগানও দেখা যায়। শীত কালে শিউলিরা সেই সকল গাছ কাটে বা কামায়, এবং গুড় নাগরি করিয়া বিক্রয় করে। আমরা ইহাই দেখিতে পাই। কিন্তু কি রূপে খেজুর গাছের আবাদ করিতে হয় এবং কত ব্যয়ে গুড় প্রস্তুত হইয়া কি লাভ থাকে, আমরা তাহার কোন হিসাবই রাখি না। যশোহর প্রদেশে কৃষকেরা যে রূপে খেজুর গাছের আবাদ ও গুড় বেচিয়া লাভ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করা গেল (১)।

প্রাচীন খেজুর গাছের তলায় যে পাকা খেজুর আপনি পড়ে, কৃষকেরা তাহা কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে হাপর

(১) বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের সংগৃহীত যশোহরের ষ্টাটিষ্টিক্যাল রিপোর্টে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

দেয়। চারা সকল বাহির হইলে সর্ব্বদা হাপরের জমি পরিষ্কৃত রাখিতে হয়। তিন বৎসরের পর, ঐ সকল চারা সম ভূমিতে লইয়া দশ বার হাত অন্তরে শ্রেণী বদ্ধ রূপে রোপণ করে। ভূমি পরিষ্কার রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চাস দিতে হয়। সাত বৎসরের মধ্যেই গাছ সকল কাটি-বার যোগ্য হয়। এক বিঘা জমিতে ন্যূন সংখ্যায় এক শত বৃক্ষ হইতে পারে। যে ভূমি উর্ব্বরা অথচ বর্ষাকালে জল প্লাবিত হয় না, তাহাই খেজুর গাছের পক্ষে উপযোগী। জলা বা লোণা জমিতে ঐ বৃক্ষ উত্তমরূপে হইতে পারে না।

আশ্বিন মাসই গাছ কাটার প্রশস্ত সময়। গাছের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কাটিতে হয়; কারণ তাহাতে ক্ষত স্থান উত্তম রূপে শুকাইতে পার। তবে গাছ ঝটিকাদি কারণে দিক বিশেষে হেলিয়া পড়িলে, কখন কখন ঐ দুই দিকে কাটার ব্যাঘাত হইতে পারে। কিরূপে গাছ কাটে এবং কিরূপে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে, তাহা এ দেশের অনেকেই অবগত আছেন। একটা গাছে নিম্ন লিখিত রূপ রস পাওয়া যাইতে পারে। গাছ প্রতি দিন কাটিতে নাই। মধ্যে মধ্যে জিরান দিতে হয়। এ ছাড়া অত্যন্ত শীত, কোয়াসা, ঝটিকা ইত্যাদি কারণেও কতক দিন গাছ কাটা কামাই যায় (১)। এই কারণে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এই চারি মাসে পঞ্চাশ দিনের অধিক গাছ কাটা হয়না।

(১) ১২৭৯ সালের মাঘ মাসে ঝিনা দহের মধ্যে কোন ভদ্র লোকের গুড়ের কারখানায় কয়েক দিন গুড়ে ভাল দানা বাঁধে নাই। অনু-সন্ধানে স্থির হইয়াছে, শীত এবং গাছের কামান অধিক হইলে "রস হালকা" হয়, তাহাতে গুড় ভাল হয় না।

ঐ পঞ্চাশ দিনে ৬ মণ রস পাওয়া যাব। দশ সের রসে এক সের গুড় হয়, এই হিসাবে ঐ রসে চব্বিশ সের গুড় হইতে পারে। উহার মূল্য ১ এক টাকা। রস একত্র করা এবং গুড় তৈয়ার করায় প্রতি গাছে।৵১০ ব্যয় পড়ে। এ হিসাবে প্রতি গাছে ।।/১০ লাভ থাকে। সুতরাং এক বিঘা জমির খেজুর গাছে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদে ৫০ টাকা লাভ অনায়াসেই থাকিতে পারে।

যে কার্য্যে আশু ফল দেখা যায় না, সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে এ দেশের অনেকেরই প্রবৃত্তি হয় না। কারণ অদ্য বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া আট দশ বৎসরান্তে তাহার লাভ ভোগ করিব আমাদের এরূপ সহিষ্ণুতা হয় না। কিন্তু কৃষি বাণিজ্যাদিতে এইরূপ সাহিষ্ণুতাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন ঐ সকল বিষয়ে ফল পাওয়া যায় না।

খ—পাঠ।

পাট।

বর্ত্তমান কালে পাট একটী প্রধান বানিজ্য সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত। দেশ যতই সভ্য হইতেছে, ততই পাটের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। দড়ি, দড়া, গুণ, চট, নৌকার পাইল, এ সকল ত আছেই, আবার যত প্রকার বিলাতী কাপড় এ দেশে আমদানী হয়, তৎসমুদায়েই পাট মিশ্রিত থাকে। ফলতঃ নানা কারণে দিন দিনই পাটের প্রয়োজন

বৃদ্ধি হইতেছে। পাট যতই উৎপন্ন করা যাইতে পারে, ততই বিক্রয় হইয়া যায়, পড়িয়া থাকিবার দ্রব্য নহে।

পাটের জমিতে উত্তমরূপে চাস ও সার দিতে হয়। বৈশাখ মাসে বীজ বপণ করিয়া থাকে। অধিক জল লাগিলে পাটের বীজ পচিয়া যায়। পাট অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে পাহাড়িয়া, বিদ্যাসুন্দর ও ধলসুন্দর এই তিন প্রকারের নাম শুনা যায়। শণ ও মেস্তাও প্রায় ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্। পাটের চারা গুলি প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণের হইলে নিড়াইয়া দিতে এবং প্রায় এক হাত পরিমাণের হইলে রুগ্ন ও পোকা ধরা চারা গুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ঐ রূপ করায় পাটের ক্ষেত্রে বায়ু ও আলোক প্রবিষ্ট হইবার কিছু সুবিধা হয়। তাহাতে উত্তম রূপে পাটের বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাটের অগ্রভাগ যাহাতে গো বা ছাগে না খাইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ তাহাতে পাট ভাল হয় না। পাটের গাছ যতই দীর্ঘ, সরল ও শাখা হীন হয়, ততই উত্তম রূপে কোষ্টা প্রস্তুত হইতে পারে। যদি রীতি মত সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে এদেশের সকল প্রকার ভূমিতেই উত্তম রূপ পাট জন্মিতে পারে।

আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে যখন দুই চারিটী পাটের গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে, তখনই পাট কাটিয়া বোঝা বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয়। তিন কি চারিদিনের মধ্যে পাট পচিয়া উঠে। তখনই কাচিয়া লইতে হয়। পাট কাচা কাহাকে বলে তাহা প্রায় সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া-

চেন। তাহার বিশেষ বিবরণ লেখা অনাবশ্যক। কিন্তু পাট পচিয়া উঠিলে কাচিতে আর কিছু মাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে সমস্ত কোষ্টা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পাট কাচা সম্বন্ধে এ দেশে একটী বিশেষ কুরীতি প্রচলিত আছে। কৃষকেরা গ্রামের মধ্যে যেখানে সেখানে একটু জল পাইলেই তাহাতে পাট পচায়। পাট, পচিলে অতিশয় দুর্গন্ধি হয়। উহার দুর্গন্ধ এবং ঐ গর্ত্তের জল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্টকর। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী ও গ্রাম বাসিদিগের দৃষ্টি রাখা উচিত।

পাট যেমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তেমনি উহার আবাদে অল্প ব্যয়ে অধিক লাভও হইয়া থাকে। ভূমির খাজনা ছয় মাসে আট আনা, আবাদ দুই টাকা, পাইট দুই টাকা, কাটাই এক টাকা, এবং পাট কাচা ও অন্যান্য খরে মোট আট টাকা খরচ। এক বিঘায় গড়ে দশ মণ পাট তৈয়ার হইতে পারে এবং উহার অন্যূন মূল্য তিন টাকা হিসাবে ত্রিশ টাকা। খরচ বাদে এক বিঘায় বাইশ টাকা লাভ থাকিতে পারে। যদি আট টাকা খরচ করিয়া চারি মাসে আট টাকা লাভ হয়, তাহাই বা কম কি?

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা গড় হিসাব। স্থল বিশেষে উহাপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে। পচিশ কাঠা জমিতে পাটের চাস করিয়া সাড়ে তিন টাকা মাত্র খরচে ছাব্বিশ টাকা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

গ—পাঠ।

আলু।

আলু নানাবিধ; তন্মধ্যে এস্থলে গোল আলু বা বিলাতী আলুর বিষয় লিখিত হইবে। যে হেতু ঐ আলুই একটী প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য এবং লাভ জনক শস্য। উহা সব্ব প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার অবণ্যে স্বভাবতই উৎপন্ন হইত। অনধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া একটী প্রধান শস্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প স্থানেই এই আলুব আবাদ হইয়া থাকে। আবার গঙ্গাব পূর্ব্ব পারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার দুই চারি খানি গ্রাম ভিন্ন আর কুত্রাপি উহার আবাদ হয় না। এমন লাভ জনক ও প্রয়োজনীয় শস্যের আবাদ, এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইবার একটী কারণ এই, অত্রত্য কৃষকগণের এই রূপ সংস্কার আছে যে গোল আলুর আবাদ সকল স্থানে হইতে পারে না; উহা যে যে স্থানে হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই হইতে পারে। সকল দেশের কৃষকে উহার আবাদ না জানাতেই ঐ রূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

আলুর ভূমি "বার মেসে" হইলেই ভাল হয়। যে ভূমিতে আর কোন শস্যের আবাদ না করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী চাস দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট শস্যের জন্য রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহাকেই "বার মেসে" ভূমি কহে। কোন কোন কৃষক আলুর

জমিতে যথা কালে কাঁকুড়, ভুঁয়ে শশা, প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করিয়া লয়। পলিমাটী, রেড়ির খৈল, এবং নীলের পাতা পচা এই তিনটী আলুর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তন্মধ্যে পলি-মাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি ভূমিতে রীতিমত ঐ মাটী তোলা যায়, তাহা হইলে আর কোন সার না দিলেও চলিতে পারে। ভূমির মৃত্তিকা আটাল হইলে খৈল দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। আলুর মাটী এমন রূপে তৈয়ার করা উচিত যেন চিনির ন্যায় সল থাকে। পলিমাটী ও জল পাওয়ার সুবিধা জন্য আলুর জমি, নদী খাল, বিল, বা পুষ্করিণীর ধারে হওয়া আবশ্যক। রাঢ় দেশীয় কৃষকেরা আলুর জমিতে বৈশাখ মাসে নীল বপণ করে। ঐ নীলের পাতা পচাতে ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা হয়। অধিকন্তু আষাঢ় শ্রাবণে ঐ নীল বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত জমিতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই আধ হাত অন্তরে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া আলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। রোপিত আলুর উপর জলের ছিটা দিবে। যত দিন চারা বাহির না হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপে ছিটা দিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তিন পোয়া ফাঁক থাকা আবশ্যক। চারা গুলি ৬।৭ অঙ্গুলি পরি-মিত হইলেই একবার সমস্ত ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিবে। প্রত্যেক বীজ হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়; ঐ সকল চারার মধ্যে যে গুলি নিস্তেজ তাহা মারিয়া ফেলিবে। তাহাতে অবশিষ্ট গুলির তেজ, আর ও বৃদ্ধি পাইবে। পরে যো হইলে মাটী উত্তম রূপে ধূলাইয়া গাছের গোড়ায় দাঁড়া

বাঁধিয়া দিবে। আট দিন অন্তর ক্ষেত্রে জল সেচিবে এবং যো হইলেই গাছের গোড়ায় মাটী ধরাইবে। ক্ষেত্রে জল সেচিলেই দাঁড়ার মাটী ঝরিয়া ঐ জলে পড়ে; জল শুকাইয়া গেলে আবার সেই মাটী উঠাইয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটী প্রশস্ত জলনালী কাটিবে এবং শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া শাখানালী সকলকে ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। এই সমস্ত জলনালী সমতল হওয়া আবশ্যক; নচেৎ সর্ব্বত্র জল সঞ্চালিত হওয়া কঠিন হয়।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে একটী বিদাকাটী কিম্বা সেই রূপ অন্য কোন কাটী দ্বারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে, কেবল মটরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি রাখিয়া চারার গোছাকে ঈষৎ হেলাইয়া পুনর্ব্বার গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আলু তুলিতে কোন রূপ অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। আলু তোলার তিন চারি দিন পরে আবার জল সেচিয়া দিবে। গোড়ার আলু গুলি একবার তুলিয়া লইলে গাছ বিলক্ষণ সতেজ হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত ছোট আলুগুলি বড় হইতে এবং যে সকল পত্র কক্ষ মাটী চাপা পড়ে, তাহাতে ও আলু জন্মাইতে আরম্ভ করে। পরে মাঘ মাসে এক কালে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে। ঐ আলু গুলি দুই ভাগে বাছাই করিয়া বড়গুলি খাইবার জন্য বেচিয়া ফেলিবে এবং ছোট গুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিবে। বীজ, উত্তম পরিষ্কৃত ও বায়ু সেবিত ঘরে মাচার উপর ছড়াইয়া কিম্বা ঝুড়ি করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা আবশ্যক। এত যত্নে রাখিলেও, যাহা রাখা যায়, প্রায় তাহার অর্দ্ধেক পচিয়া যায়।

পত্রকক্ষে যে সকল অপেক্ষাকৃত ছোট আলু জন্মে, তাহাই উত্তম বীজ হয়; কারণ ঐ রূপ আলুতে অনেক চক্ষু থাকে, সুতরাং তাহা হইতে অনেক চারা বাহির হয়।

এক বিঘা আলু করিতে হইলে, চাষে ৫, পলিমাটী তোলায় ২, আলু পোতা ১, বীজ ১২, জল সেচা ৮ এবং জমির খাজনা ৩ টাকা; মোট ৩১ টাকা ব্যয়। বীজ ছোট হইলে প্রতি বিঘায় দেড় মণ এবং বড় হইলে পাঁচ ছয় মণ লাগে। বড় আলু পোঁতায় কৃষকের ক্ষতি হয়; কিন্তু হুটলণ্ড দেশীয় কৃষকেরা বড় আলুকে তিন কিম্বা চারি খণ্ড করিয়া রোপণ করে, তাহাতে ক্ষতি হয় না।

প্রতি বিঘায় প্রথম ভাঙ্গায় ২০ হইতে ২৫ মণ আলু পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বারেও প্রায় ঐ রূপ আলু পাওয়া যায়। পৌষ মাসের প্রথমে যে আলু হয়, তাহার মূল্য ৩ হিসাবে অন্যূন ৬০ টাকা। দ্বিতীয় বারেও আলু ১ হিসাবে ২০ টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বারের আলু কৃষকেরা বীজ রাখে এবং উহার মধ্যে পচা বীজ বাদ দিয়াও দশ মণ থাকে। ঐ দশ মণ ন্যূন সংখ্যায় ৬০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। তাহাতে মোট ১২০ টাকা হইতে পারে। উহা হইতে ৩০ টাকা হিসাবে খরচ বাদ দিলে প্রতি বিঘায় ৯০ টাকা লাভ থাকে। যদি বীজ হিসাবে নাই বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলেও লাভ ৫০ পঞ্চাশ টাকার কম হয় না।

রাঢ় দেশীয় কৃষকেরা আলু পৌষ মাসের শেষে কিম্বা মাঘের প্রথমে এক বারেই ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে তাহা-

দের আলু কিছু বড় হয়। ঐ দেশের ফলন, ৪০ মণ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (১)।

ঘ—পাঠ।

হরিদ্রা।

নূতন জমিতে হলুদ করিতে হইলে কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে একবার উত্তম রূপে জমি কোদ্‌লাইয়া রাখিতে হয়; পরে চৈত্রের শেষে কিম্বা বৈশাখের প্রথমে যেমন জল হইবে, তেমনিই "যো" দেখিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি সমান করিতে হয়। হলুদের জমিটী সমান হইবে, অথচ পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা একটু নিম্ন হইলে আব ও ভাল হয়। পরে আধ হাত অন্তর এক এক খান মোতা কিম্বা বড় বড় পাশ মুখী শারি বাঁধিয়া পুতিবে। উভয় শারির মধ্যে অন্যূন দেড় হাত জমি রাখিয়া দিবে। ঐ ফাকের মধ্য হইতে এক এক কোদাল মাটী লইয়া ঐ প্রোথিত বীজের উপর দিয়া যাইবে। তাহাতে বৃষ্টির জলে বীজ সকল পচিয়া যাইবে না। নদীয়া, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি জিলায় হলুদের চাস অধিক নাই, যে দুই এক স্থানে আছে, তথায় উক্ত প্রণালীতে বীজ রোপণ করা হয় না। কোদালের ঠোকা দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে বীজ পোতা হয়। তাহাতে বীজ অধিক লাগে, ফলনে কম হয় এবং হলুদ তুলিবার সুবিধা হয় না।

---

(১) আলু, কপি, তামাক প্রভৃতির মধ্যে যে সকল রূঢ় বা যৌগিক পদার্থ আছে, উহাদিগের সারেও প্রায় সেই সকল পদার্থ আছে।